একই পদার্থ অবস্থানুসারে ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা লাভ করে। পুরুষের যে প্রকৃতি তাহার সর্ব্বকল্যাণদায়িনী, সেই প্রকৃতিই আবার তাহার সর্ব্বনাশিনী হইয়া থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত মনে সত্ত্বরজ ও তমের সমতা থাকে, ততদিন আর মনের কোন বিকার নাই এবং যেই সত্ত্বরজস্তমের বৈষম্য উপস্থিত হয়, অমনি মনেরও বিকার উপস্থিত হয়। তদ্রূপ এই দেহে যত দিন বায়ু পিত্ত ও কফের সমতা থাকে, ততদিন আর দেহে কোন রোগ থাকে না। এই বায়ু পিত্ত কফই দেহকে ধারণ করিয়া রাখে বলিয়া ইহাদের নাম ধাতু। এই ধাতুভূত বায়ু পিত্ত কফ যখন বিকৃত হইয়া দেহকে দূষিত করে, তখন ইহারাই দোষ সংজ্ঞায় অভিহিত হয়। সুতরাং বাত পিত্ত কফ দ্বারাই দেহ রক্ষা প্রাপ্ত হয় এবং বাত পিত্ত কফ দ্বারাই শরীর ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। যে বাত পিত্ত কফ ভুক্ত পদার্থের সাত্ম্যরস দ্বারা পরিপুষ্টি লাভ করে,—সেই বাত পিত্ত কফই জীবের ভুক্ত পদার্থের অসাত্ম্য রস হইতে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব আহার্য্য পদার্থের রসের দ্বারাই জীবের জীবন ও মৃত্যু। কোন্ কোন্ পদার্থের রস কতটুকু মাত্রায় জীবনযাত্রার পক্ষে প্রয়োজন তাহা জীবের প্রকৃতিই নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। যাহার প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি জ্ঞানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে তাহার আহার বিহার সকলই তাহাকে মরণের হাত হইতে রক্ষা করে। এবং যাহার প্রকৃতি বা মনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে, তাহার আহার বিহার সকলই তাহাকে মরণের দিকে অগ্রসর করিয়া দেয়। এজন্য অজ্ঞানীর আধি ব্যাধি ছাড়া কিছু নাই ইহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মাত্রেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে।

জীব-প্রকৃতি যেমন জীবন রক্ষার জন্য অভিমত ভোজ্যাদির কামনা করে, তদ্রূপ দেহ প্রকৃতিও বিকৃত এবং বিষম বাতাদি দোষ শান্তির নিমিত্ত তাৎকালিক অভিমত পদার্থ ভোজনের ইচ্ছা প্রকাশ করে। প্রকৃতি অজ্ঞ ও অন্ধ, সে জন্য সে কোন জিনিষ কতটুকু মাত্রায় তৎকালে আবশ্যক তাহা স্থির করিতে পারে না। এজন্য জ্ঞানকে প্রকৃতির সাহায্য করিতে হয়। কিন্তু সকলের সকল বিষয়ে জ্ঞান থাকে না। এ জন্য অজ্ঞ ব্যক্তি তত্তৎ- বিষয়ে অভিজ্ঞব্যক্তির শরণাপন্ন হয়। তিনি তাহাকে তদ্বিষয়ে জ্ঞান দিয়া সাহায্য করেন। সেই জন্য বিজ্ঞ চিকিৎসকের এত সম্মান এত সমাদর।

মূক ব্যক্তি যেমন শূলারোগাক্রান্ত হইলে কেবল ছটফট করিয়া আভ্যন্তর যন্ত্রণার প্রকাশ করিয়া থাকে, মুখে কিছু বলিতে পারে না, তদ্রূপ প্রকৃতিও কতকগুলি দৈহিক ভাবের ব্যতিক্রম ও বৈপরিত্য ঘটাইয়া নিজের অবস্থা প্রকাশ করিয়া থাকে, মুখে কিছু বলিতে পারে না। অভিজ্ঞ চিকিৎসক সেই সকল অবস্থা বিশেষ ভাবেপর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রকৃতির আরোগ্য কার্য্যের সহায়তা করে।

জীবদেহে যেমন বাত-পিত্ত-কফময়ী প্রকৃতি আছে, তেমনই বহির্জগতেও বাত পিত্ত কফময়ী প্রকৃতি আছে। বহির্জগতে বাত পিত্ত কফময় মহাস্রোতঃশীলসাগরে জীবসমূহ ডুবিতেছে ভাসিতেছে ও ঘুরিয়া

বেড়াইতেছে। যেমন জলস্থিত মৎস্যাদি জলে বাস করে, তদ্রূপ মৎস্য যেমন জলশূন্য হইলে সে আর বাঁচে না, তদ্রূপ, জীবসমূহও বহির্জাগতিক বাতপিত্তকফময়ী প্রকৃতির কৃপা হইতে বঞ্চিত হইলে মরিয়া যায়। জীবের দৈহিক প্রকৃতি যেমন দেহকে কুশলে রাখিবার জন্য যখন যে দ্রব্যটীর আবশ্যক তখনই সেই দ্রব্যটী তাহাকে দিয়া কৃতার্থ করে, তদ্রূপ বাহ্য প্রকৃতিও জীবসমূহের কল্যাণের নিমিত্ত পর্য্যায়ক্রমে শীত গ্রীষ্ম ও বর্ষাদি ঋতু সকলকে আনিয়া দেয় এবং ঋতু সকলও বাহ্য প্রকৃতির আক্রমণ জন্য দৈহিক বিকার প্রশমনের নিমিত্ত নানাবিধ দ্রব্য সকল উৎপন্ন করিয়া জীবের স্বাস্থ্যরক্ষা করে। এ জন্য গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রৌদ্রবাধা নিবৃত্তির জন্য কচি তালশাঁস ও নানাবিধ সুমিষ্ট ফল, সকল শরতের প্রখর পিত্তের প্রশমনের জন্য নদীকূপ তড়াগাদির সুশীতল জলরাশি, কুমুদ কহ্লার নীলোৎপলাদি পুষ্পসমূহ, সুধাধবল চন্দ্রকিরণ এবং বসন্তে বসন্তের প্রকোপ নিবৃত্তির জন্য কচি কচি নিমপাতা, পল্‌তা, পটোল প্রভৃতি,—জীবের কল্যাণের নিমিত্ত বাহ্য প্রকৃতির দান। এই বাহ্য প্রকৃতির নাম জগন্মাতা, জগদ্ধাত্রী ও লোক-মাতা এবং যাঁহার আদেশে সেই জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের কল্যাণের জন্য সংসার সাজাইয়া বসিয়াছেন, তাঁহার নাম জগৎপিতা, জগদ্ধাতা, জগদীশ্বর। আমরা সকলেই তাঁহার সন্তান। আমাদিগকে লইয়াই প্রকৃতি পুরুষের সংসার। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সেই জগন্মাতা ও জগৎ-পিতার চরণ-কমলে ভূয়ো ভূয়ো প্রণাম করিতেছি। ওঁ শান্তিঃ! ওঁ স্বস্তি! ওঁ শ্রীহরিঃ!

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা।

(কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন)

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা যে জাগতিক সর্ব্ব প্রকার চিকিৎসার মূল ভিত্তি, সে বিষয়ে মত দ্বৈধ নাই। বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা হইতে দক্ষ প্রজাপতি, দক্ষ প্রজাপতি হইতে অশ্বিনী কুমারদ্বয়, অশ্বিনী কুমারদ্বয় হইতে দেবরাজ ইন্দ্র যখন এই বিদ্যা আয়ত্ত করিলেন, তখন মর্ত্ত্যলোকে রোগ-রাক্ষস দিগের উপদ্রবে অস্থির হইয়া ভরদ্বাজ প্রমুখ ত্রিকালদর্শী ঋষিবৃন্দ এই পরম লোক হিতকর চিকিৎসা-বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। মর্ত্ত্যভূমিতে আয়ুর্ব্বেদের প্রচার এইরূপে আরম্ভ হইয়াছিল।

আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাসে আমরা আরও অবগত হই,—অশ্বিনী কুমারদ্বয়ের নিকট হইতে একদিকে দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ আয়ুর্ব্বেদের শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অন্য দিকে সেইরূপ ধন্বন্তরিও সেই বিদ্যা আয়ত্ত করেন। সেই ধন্বন্তরিই বারাণসীধামে

দিবোদাস রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং মহর্ষী সুশ্রুত প্রভৃতি অনেক গুলি সর্ব্বত্যাগী আর্য্য ঋষিকে শিক্ষাদান করিয়া মর্ত্তাধামে আয়ুর্ব্বেদের বিশেষ প্রচার করিয়াছিলেন। ভরদ্বাজ প্রমুখ ঋষি বৃন্দ দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট হইতে চিকিৎসার যে সকল বিষয় শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার পক্ষে সম্পূর্ণ নহে, কারণ তাহা কায়চিকিৎসাপ্রধান, চরক তাহারই ফলে আবিষ্কৃত হইল। মহর্ষি সুশ্রুত তাঁহার অধীত চিকিৎসা-বিদ্যাকে আট ভাগে বিভক্ত করিয়া জনসাধারণের উপকারার্থে যে সংহিতাখানি প্রণয়ন করিলেন, তাহার নাম হইল সুশ্রুত সংহিতা। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের শিক্ষালাভ করিতে হইলে এই সংহিতা খানিই আয়ত্ত করা কর্ত্তব্য বোধে তাঁহার বহু শিষ্য প্রশিষ্য উহার শিক্ষালাভ করিলেন। চরকের শিক্ষায় যাঁহারা কৃতবিদ্য হইলেন, শস্ত্রকর্ম্মে তাঁহারা কৃতিত্ব না দেখাইলেও মহর্ষি সুশ্রুতের শিষ্য প্রশিষ্যেরা কিন্তু শস্ত্র সাধ্য কার্য্যে পারদর্শিতা দেখাইয়া জগদ্বাসীকে বিস্ময় বিমুগ্ধ করিয়া তুলিলেন। এক কথায় সে সময় ঋষিবৃন্দের চেষ্টায় শুধু মনুষ্য চিকিৎসা নহে, গবায়ুর্ব্বেদ, হস্তী আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি সকল প্রাণীর দীর্ঘায়ু ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য নানারূপ চিকিৎসারই চরম উৎকর্ষ সাধিত হইল।

রোগ-রাক্ষসগণ প্রাণী-জগতে নানা মূর্ত্তিতে উপদ্রব আরম্ভ করিলেও জগদ্বাসী মাত্রেই দেখিল, রোগ-রাক্ষসগণ ভারতবর্ষীয় লোক-দিগের সহিত দমিয়া যাইতেছে, জ্বর অতিসার প্রভৃতি নানারূপ আধি ব্যাধিতে বিশ্বসংসার যতই বিপর্য্যস্ত হউক, আর্য্য ঋষির ঐকান্তিক সাধনায় তাহার মূলোচ্ছেদ হইতেছে। অনেক সময় আর্য্য ঋষির উপদেশে স্ববৃত্তি ও সদাচার পালনে রোগ-রাক্ষসগণ অনেকের নিকট ঘেঁসিতেই পারিতেছে না। ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য দেশের চিন্তাশীল মনীষীরা এই ব্যাপার সন্দর্শনে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না,—ভারতের সর্ব্ব প্রধান গৌরব —এই চিকিৎসাবিদ্যা শিখিবার জন্য দৃঢ় সংকল্প হইলেন। এই সংকল্প প্রথমে মনে আসিল আরবীয়গণের, তাঁহারাই আর্য্যভূমি ভারতবর্ষ হইতে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা লাভ করিলেন, তাহার পর আরবের শিষ্য হইলেন গ্রীসবাসিগণ। ক্রমে গ্রীস দেশ হইতে এই চিকিৎসা সমগ্র বিশ্বে ছাইয়া পড়িল। বিশ্ব সংসারে চিকিৎসা বিদ্যার প্রচারের ইহাই হইল সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এই ইতিহাসে আমরা বুঝিলাম, ভারতবর্ষই চিকিৎসা বিদ্যা প্রচারের প্রথম প্রবর্ত্তনা করিয়াছে।

কালে ঋষিকুল নির্ম্মূল হইল, শাস্ত্র-তন্ত্র-পুরাণ-জ্যোতিষ-বেদ-বেদাঙ্গ—সকল বিষয়েরই প্রথম প্রচারকারী আর্য্য ঋষির দল ভারতবর্ষ হইতে চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইলেন, তাঁহাদের স্মৃতি রক্ষার জন্য তাঁহাদের বংশধরেরা আর্য্যপ্রদেশে বাতি দিতে রহিলেন বটে, কিন্তু ফলমূলাশী আর্য্য-ঋষির পন্থানুসরণে তাঁহাদের গৌরব রক্ষা করিবার উপযুক্ত বংশধর একজনও রহিল না। ইহারই ফল হইল আর্য্যবাসীর প্রচারিত চিকিৎসা বিদ্যা অন্যদেশে সমুন্নতি লাভ করিল, আর ভারতবাসিগণ তাঁহাদেরই জিনিস অপরকে বিলাইয়া

দিয়া চিকিৎসা বিদ্যার কৃতিত্ব দেখিয়া বিদেশবাসীর যশোকীর্ত্তন সহস্র কণ্ঠে করিতে অভ্যস্ত হইল।

এক সময়ে অষ্টাঙ্গ-আয়ুর্ব্বেদের চর্চ্চা যে ভারতবর্ষে যথেষ্টই হইয়াছিল, সে কথা প্রমাণ করিতে আজ আর চেষ্টা করিব না, কিন্তু ভারতবর্ষের বর্ত্তমান যে ভীষণ অবস্থা দাড়াইয়াছে, তাহা দেখিয়া আতঙ্ক হইতেছে, যে অদূর ভবিষ্যতে বুঝি আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা ভারতবর্ষ হইতে লুপ্ত হইয়া যাইবে। পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্যে বোটানি বা উদ্ভিদ্ বিদ্যার শিক্ষা প্রদান করিবার রীতি আছে, কিন্তু ভারতীয় ঋষি প্রচারিত দ্রব্যবিজ্ঞান যে কিরূপ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, তাহা পাঠ করিলে আনন্দ রসে আপ্লুত না হইয়া থাকিতে পারা যায় না। উদ্ভিদের মূল আছে, কাণ্ড আছে, পত্র আছে, ফল আছে, তাহার পুষ্প এই প্রকার, পুষ্পরেণু এই প্রকার—বোটানিতে আমরা 'এই রূপ যে সকল শিক্ষা লাভ করি, আয়ুর্ব্বেদের দ্রব্য-বিজ্ঞান পড়িলে সে সকল শিক্ষা লাভ তো সহজেই হইয়া থাকে, তদ্ভিন্ন আয়ুর্ব্বেদের দ্রব্য বিজ্ঞান পড়িলে দ্রব্য মাত্রেরই বিশ্লেষণ-শিক্ষা আমরা যেরূপ ভাবে প্রাপ্ত হই, সেরূপ শিক্ষা আর কিছুতেই হইতে পারে না। আয়ুর্ব্বেদ দ্রব্য বিশ্লেষণে বলিয়াছেন,—

দ্রব্যে রসো গুণো বীর্য্যং বিপাকঃ শক্তিরেবচ।
পদার্থাঃ পঞ্চ তিষ্ঠন্তি স্বং স্বং কুর্ব্বন্তিকর্ম্ম চ॥"

অর্থাৎ রস, বীর্য্য, বিপাক ও শক্তি, এই পাঁচটী পদার্থ দ্রব্যে অবস্থিতি করে, ইহারা দ্রব্যে স্বীয় স্বীয় কার্য্য সম্পন্ন করে। তাহার পর রসের শ্রেণীবিভাগে ছয় রস, গুণের শ্রেণীবিভাগে পাঁচ প্রকার গুণ, দুই প্রকার বীর্য্য এবং তিন প্রকার বিপাকের কথা এত সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহা আয়ত্ত করিতে পারিলে দ্রব্যবিজ্ঞানে আর কিছুরই অভাব থাকে না। ইহা ভিন্ন দ্রব্যবিজ্ঞান প্রসঙ্গে প্রভাব বলিয়া একটি বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা এই,—

বিরুদ্ধ গুণ সংযোগে ভূয় সাল্পং হি জায়তে।
রসং বিপাকস্তৌ বীর্য্যং প্রভাবস্তান
ব্যাপোহতি॥

অর্থাৎ বিরুদ্ধ গুণের সংযোগে কখন দোষের বৃদ্ধি, কখন বা দোষের হ্রাস হইতে পারে। সুতরাং রসাদি দ্বারা ফল স্থির করা সঙ্গতপর নহে, বিশেষতঃ বিপাক—রসকে, বীর্য্য—রস ও বিপাককে, রস—এই উভয়কে এবং প্রভাব—রস, গুণ ও বীর্য্যের গুণকে পরাভব করে। এই প্রভাব চিন্তার বিষয় নহে, চিন্তা করিলেও এই প্রভাব বুঝিতে পারা যাইবে না, সুতরাং ইহার মীমাংসায় এই প্রভাবকে আমরা দ্রব্যশক্তি ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারি না।

শল্য শালাক্য প্রভৃতি চিকিৎসা শিক্ষার অভাবে যে সময় আর্য্যচিকিৎসার অবনতি আরম্ভ হইল, দ্রব্যবিজ্ঞানের চেষ্টাও সেই সময় হইতে ভারতীয় চিকিৎসকদিগের মধ্যে কমিয়া আসিতে লাগিল। অধুনা তো দেশের অবস্থা "এমনই দাঁড়াইয়াছে যে, অধিকাংশ চিকিৎসকই অনেক তরু-গুল্ম-লতা চিনিতে পারেন না, সেই

দ্রব্যের রস, গুণ, বীর্য্য, বিপাক তাঁহারা হয় তো পুস্তকেই পড়িয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহা আর তাঁহাদের পরীক্ষা করিবারই আবশ্যক ঘটে নাই। ভরদ্বাজ প্রমুখ ঋষি-প্রবর্ত্তিত চিকিৎসায় সুশ্রুতের মত অষ্টাঙ্গ চিকিৎসার সম্পূর্ণ উপদেশ না থাকিলেও চরকের দ্রব্যবিজ্ঞান এতই অপূর্ব্ব যে, শস্ত্রকর্ম্মে পারদর্শী না হইয়াও কেবল মাত্র দ্রব্যবিজ্ঞানের সাহায্যে অনেক শস্ত্র সাধ্য ব্যাপারও উহা দ্বারা আরোগ্য হইতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কার্ব্বঙ্কলের চিকিৎসায় "ছোট গোয়ালে লতা"র পাতার কথা উল্লেখ করিতে পারি। কার্ব্বঙ্কল পাশ্চাত্য চিকিৎসায় 'অপারেসন' বা শস্ত্রসাধ্যকর্ম্ম; কিন্তু এই ছোট গোয়ালে লতার পাতা লাগাইলে কার্ব্বঙ্কল অপারেশন না করিয়াও আরোগ্য করা যাইতে পারে। সাধারণ স্ফোটক বা ফোড়া পাকাইবার জন্য এবং ফাটাইবার জন্য আয়ুর্ব্বেদে' 'অসংখ্য বনৌষধি রহিয়াছে, সেই সকল দ্রব্যের সময়োপযোগী প্রয়োগে শস্ত্রকর্ম্ম না করিয়াও ব্যাধি আরোগ্য করিতে পারা যায়। আমরা সেই সকল দ্রব্যবিজ্ঞানের ব্যবস্থা ছাড়িয়া দিয়াছি, এ অবস্থায় আয়ুর্ব্বেদের দুরবস্থা হইবে না তো কি!

দ্রব্যবিজ্ঞানের চর্চ্চা আমাদের দেশবাসী ছাড়িয়া দিয়াছেন, কিন্তু পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিদ্যাবিশারদগণ শস্ত্রসাধ্যকর্ম্মে উৎকর্ষ লাভ করিয়া যেমন আর্য্যচিকিৎসার গৌরব রক্ষা করিতেছেন, সেই রূপ আর্য্যচিকিৎসার অন্যতম গৌরব দ্রব্য বিজ্ঞান হইতেও কতকগুলি বিশেষ দ্রব্য নির্ব্বাচন করিয়া লইয়া সেই সকলের প্রচারে উদ্যোগী হইয়াছেন। কালমেঘ, অশোক, বাসক, গুলঞ্চ, পুনর্ণবা প্রভৃতির তরলসার বা Extract ইহারই ফল সম্ভূত। আর্য্য চিকিৎসার দ্রব্যবিজ্ঞানের অপূর্ব্ব শক্তির পরিচয় মকরধ্বজ এবং মৃগনাভিতে উপলব্ধি করিয়াই ঐ ঔষধ দুইটী তো তাঁহারা তাঁহাদের ফারমাকোপিয়ার মধ্যে এরূপ অন্তর্নিহিতই করিয়া লইয়াছেন। ঐ সকল দ্রব্য ভারতবাসীর নিজস্ব হইলেও পাশ্চাত্য শিক্ষায় অনুপ্রাণিত ভারতবাসীর অবস্থা এমনই দাঁড়াইয়াছে যে, পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ যতক্ষণ পর্য্যন্ত না উহার ব্যবস্থা করিতেছেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত উহার প্রতি তাঁহাদের আস্থা উপস্থিত হইতেছে না। ফলে আর্য্যভূমির গর্ব্বগরিমা চিকিৎসা বিদ্যার অবনতি সাধনের যে ভারবাসীই প্রকৃষ্ট কারণ, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।

শাস্ত্র বলিয়া গিয়াছেন—

"যস্য দেশস্য যো জন্তুঃ তজ্জো তদৌষধম্
হিতম্।"

অর্থাৎ যে দেশের প্রাণী,—সেই দেশজাত ঔষধই তাহার পক্ষে উপযুক্ত। পৃথিবীর সকল দেশের লোকে এ কথা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করে, কিন্তু ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতবাসী একথা কোনো কালেই বুঝে, নাই, এখনো বুঝিতেছে না। নতুবা যে কয়টি তরলসার বা Extract এর কথা প্রসঙ্গ ক্রমে উল্লেখ করিয়াছি, সেই কয়টি দ্রব্য ভারতভূমির পল্লী প্রান্তরে অযত্ন সম্ভূত, পল্লী প্রান্তরের কথাই বা বলি কেন, পল্লীবাসীদিগের আবাসবাটীর চারিপার্শ্বে ঐ কয়টী

দ্রব্য যেখানে সেখানে বিদ্যমান রহিয়াছে। পল্লীবাসীর উদ্যান বাটিকায়, বেড়ার অনেক স্থলেই গুলঞ্চের অভাব নাই, নিম্ববৃক্ষ তো পল্লীভূমির সকল স্থলেই। কালমেঘ, পুনর্নবাকে দলিত করিয়া পল্লীবাসী যাতায়াত করে, এমন অবস্থায়, বিলাতি শিশির চাকচিক্য দেখিয়া, লেবেল মোড়কের আড়ম্বর দেখিয়া অধিক মূল্য দিয়া সে সকল ঔষধ আমরা ক্রয় করিয়া অর্থ নষ্ট করি কেন? ভারতের অর্থ কি এতই সুলভ? ভারতবাসীর পেটে অন্ন নাই, পরণে বস্ত্র নাই, উদর জ্বালায় ভারতের অধিকাংশ অধিবাসী বিপর্য্যস্ত, এ অবস্থায় ভারতবাসী পাশ্চাত্য মোহে মুগ্ধ হইয়া অনায়াসলভ্য ঔষধ সকল অধিক মূল্য দিয়া ক্রয় করে কেন? বিশেষতঃ তরল সার অপেক্ষা স্বরসে যে অধিক উপকার হইয়া থাকে। স্বরস বা নির্য্যাসের ব্যবহারে সদ্যঃ ফল পাওয়া যাইবে, অর্থ দিয়া উহা ক্রয় করিতে হইবে না, সহরবাসীর পক্ষে অর্থ দিয়া উহা ক্রয় করিলেও দু' এক পয়সার উহা সংগৃহীত হইবে, তথাপি ভারতবাসী তাহা না করিয়া অন্য পন্থা অবলম্বন করিবে, ইহা ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

বর্ত্তমান যুগে যতগুলি কারণে দেশবাসীর স্বাস্থ্য হানি ঘটিতেছে, অল্পায়ুঃ, অকাল বার্দ্ধক্য প্রভৃতি যতগুলি ব্যাপার ভারতবাসীর অদৃষ্টে ঘটিতেছে, উহার সর্ব্বপ্রধান কারণ যে ভারতবর্ষে অন্যরূপ চিকিৎসার প্রচলন, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। ভারতবর্ষের চিকিৎসা বায়ু পিত্ত কফকে অবলম্বন করিয়া করিতে হয়। আয়ুর্ব্বেদ এই তিনটিকে দোষ সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। এই সকল দোষ কুপিত হইলে সেই সকলের প্রতিকারোপায়ের মত প্রতিকারের সময় নির্দ্দেশও আয়ুর্ব্বেদের ব্যবস্থা অর্থাৎ ঐ সকল দোষ কুপিত হইলে পাচন ও শমন ঔষধ দিয়া ঐ সকল দোষের চিকিৎসা করিতে হয়—ইহাই আয়ুর্ব্বেদের মত। পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান এ মতের পরিপোষক নহেন, তাঁহারা চাহেন রোগ দূর করিতে, আয়ুর্ব্বেদ চাহেন মূল দোষ দূর করিতে। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ এই জন্যই জ্বরের মগ্নাবস্থায় কুইনাইন প্রয়োগ বন্ধ রাখিতে পারেন না,—আয়ুর্ব্বেদ জ্বরের মগ্নাবস্থা দেখিলেই জ্বর রোধক ঔষধ দিতে ইচ্ছুক নহেন। আয়ুর্ব্বেদ জানেন, দোষের পরিপাক করিতে পারিলেই জ্বর আপনা হইতেই ছাড়িয়া যাইবে। পাশ্চাত্য চিকিৎসার সহিত আয়ুর্ব্বেদের চিকিৎসার বিশেষত্ব এই খানেই। এই বিশেষত্বই আয়ুর্ব্বেদের গৌরব। দেশের দুর্ভাগ্য বশতঃ আয়ুর্ব্বেদের এই বিশেষত্ব বুঝিবার প্রবৃত্তি এখন আর দেশের লোকের নাই। আয়ুর্ব্বেদের অবনতি এমনই করিয়াই দাঁড়াইতেছে।

আর্য্যভূমির সর্ব্বপ্রধান গৌরব আর্য্যচিকিৎসায় নাই কি? ধাত্রী বিদ্যা—যে ধাত্রী বিদ্যা লইয়া এখন পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ দেশবাসীকে বিস্ময় বিমুগ্ধ করিতেছেন, সেই ধাত্রী বিদ্যার প্রচলন আয়ুর্ব্বেদে এত সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে এবং সেই সকল চিকিৎসার দ্বারা এত উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়, যাহা দেশবাসীর বিস্ময় পাশ্চাত্য চিকিৎসা অপেক্ষা অধিকতর উৎপাদন

করিতে পারে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আমরা এখন মন্ত্র বা অন্য কোনোরূপ প্রকরণ বিধি মানিতে চাহিনা, কিন্তু মন্ত্র প্রয়োগ, 'বত্রিশের ঘর পূরণ' এবং গর্ভিণীর শিরো দেশে দ্রব্য বিশেষের বন্ধন-ব্যবস্থায় যে সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার সহিত এক দিকে যেমন আসুরী ব্যবস্থা করিতে হয় না, অপর দিকে সেইরূপ তদ্বারা অতি শীঘ্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইতে পারে। পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী ভারতবাসী এ সকল কথা মানিবেন কি? এই সকল ব্যবস্থা না মান্য করার জন্য এক দিকে যেমন অর্থ নষ্ট হইতেছে, অপর দিকে সেইরূপ আর্য্য চিকিৎসা ব্যবসায়ী দিগকেও চিকিৎসার সকল প্রকার অনুশীলনের অবসর দেওয়ার বিঘ্নোৎপাদন করা হইতেছে। দেশের চিন্তাশীল মণীষিগণ অন্য চিন্তা ছাড়িয়া এই সকল চিন্তায় মনোযোগী হউন। স্মরণ রাখিবেন, আয়ুর্ব্বেদকে অগ্রে বাঁচাইতে পারিলে তবে দেশ রক্ষা হইবে। আগে আয়ুঃ রক্ষার ব্যবস্থা, তাহার পর অন্য চিন্তা। আমাদের বুদ্ধি-বিপর্য্যয়ে যদি আমরা ভগ্নস্বাস্থ্যই হইয়া পড়িলাম, অকাল বার্দ্ধক্য এবং 'অল্পায়ুঃকে বরণ করিয়া লইয়া যদি মরণের জন্যই আমরা প্রস্তুত হইলাম, তবে দেশের চিন্তা আমরা করিব কি? আমরা আবার বলিতেছি, হে দেশের কর্ম্মী-পুরুষ মণ্ডলি! আগে তোমরা ভ্রান্ত পথ ছাড়িয়া তোমাদের চিকিৎসার পক্ষে সর্ব্ব প্রকার উপযোগী সনাতন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার পুনরুন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর হও, তোমাদের পক্ষে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাই একমাত্র উপযোগী কিনা, অন্য চিকিৎসার শরণ লইয়া তোমরা আগের অপেক্ষা অধিক সবল, সুস্থ ও আয়ু লাভ করিতে পারিতেছ কি না এবং তাহার ফলে তোমাদের প্রাণপাত পরিশ্রমের অতি কষ্টার্জ্জিত অর্থের অপব্যবহার হইতেছে কিনা—এ সকল কথা চিন্তা কর, শুধু চিন্তা করিয়া নহে, চিন্তা করিয়া সর্ব্বাগ্রে সকল কর্ম্মের পূর্ব্বে ইহার প্রতিবিধানে যত্নপর হও, ইহাই তোমাদের নিকট প্রার্থনা করিতেছি।

আয়ুর্ব্বেদের বনৌষধি।

(কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত ভিষগরত্ন)

ঋষি প্রচারিত আয়ুর্ব্বেদে যে সমস্ত ভেষজের বর্ণনা আছে, তাহার প্রত্যেকটির দ্বারাই বহুবিধ রোগের যে চিকিৎসা করা যাইতে পারে, তাহা বিশেষজ্ঞ মাত্রই অবগত আছেন। আমার তো মনে হয়, যদি সকল অধিকারের সকল প্রকার ঔষধ প্রস্তুত নাও থাকে এবং চিকিৎসক যদি দ্রব্য বিজ্ঞানে পারদর্শী হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে কোনো প্রকার চিকিৎসা করাই কঠিন হয় না। আয়ুর্ব্বেদের ঔষধ মাত্রেই অধিকার ক্রমে বর্ণিত হইলেও একই ঔষধে যেমন বহুবিধ ব্যাধি আরোগ্য করা যাইতে পারে,

সেইরূপ আয়ুর্ব্বেদীয় তরু গুল্ম লতা পত্র, পুষ্প, ও ফলাদির প্রত্যেকটির ব্যবহারে নানা বিধ রোগ আরোগ্য করা যাইতে পারে। নানা দ্রব্যের সংমিশ্রণে প্রস্তুত বড় বড় নামজাদা ঔষধ সেবন না করাইয়া যিনি এইরূপ এক একটী ভেষজের দ্বারা চিকিৎসা করিয়া সাফল্য লাভ দেখাইতে পারেন, তাঁহারই চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করা সার্থক হইয়াছে বলিতে হইবে।

আগে এইরূপ চিকিৎসারই প্রচলন ছিল। তখন আমাদের দেশে পাশ্চাত্যদেশের অনুকরণে ডিস্পেন্সোরির প্রচলন হয় নাই। ছাপার পুস্তকেরও তখন বড় একটা চলন ছিল না। তালপাতা বা তুলট কাগজে তখন বৈদ্যদিগের চিকিৎসার বিষয়গুলি লিখিয়া রাখা হইত। বৈদ্যগণ চিকিৎসার বিষয়গুলি পুথির ভিতর লিখিয়া রাখিয়াই নিশ্চিন্ত হইতেন না, সেই সমস্ত বিষয় তাঁহাদের হৃদয় মধ্যে এরূপ ভাবে নিহিত রাখিতেন যে, তাহার জন্য ঔষধ প্রস্তুত থাকুক আর না থাকুক, কোনো রোগীর চিকিৎসা করাই তাঁহাদের নিকট কিছু মাত্র আটকাইত না। ইহার প্রধান কারণ ছিল, তাঁহাদের দ্রব্যবিজ্ঞানে বিশেষ জ্ঞান। বর্ত্তমান সময়ে বৈদ্য মাত্রের নিকটেই যে সে জ্ঞানের অভাব হইয়াছে, আমি এমন কথা বলিতেছি না, কিন্তু সে কালের মত দ্রব্যবিজ্ঞানে সেরূপ বিশেষজ্ঞ হইবার চেষ্টা এখন সকলে করেন কি না তাহা জানি না।

দ্রব্য-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইলে শুধু পুস্তক পড়িয়া সে কার্য্য সিদ্ধ হয় না, দ্রব্য চিনিবার জন্য দ্রব্য সকল নিজে আহরণ করিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। আগেকার বৈদ্যদিগের অনেকেই সেই ব্যবস্থা পালন করিতেন। তাহার ফলে তখনকার দিনে সকল অধিকারের সকল প্রকার ঔষধ প্রস্তুত না রাখিলেও চিকিৎসা কার্য্যে তাঁহাদের কোনো বাধাই উপস্থিত হইত না।

বাস্তবিক দ্রব্য বিজ্ঞানে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে পারিলে সকল প্রকার ঔষধ প্রস্তুত না রাখিয়াও সকল প্রকার রোগেরই চিকিৎসা করিতে পারা যায়। আয়ুর্ব্বেদের প্রত্যেক ভেষজই যে নানাবিধ ব্যাধিবিনাশক সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি ভেষজের কথা উল্লেখ করিতেছি,—

১ম—ত্রিফলা।

হরীতকী, আমলকী ও বহেড়ার মিলিত নাম ত্রিফলা। এই তিনটি ভেষজের প্রত্যেকটি কিরূপ বহু রোগনাশক তাহা নিম্নে বিবৃত করিতেছি—

হরীতকীর পরিচয়ে ঋষি বলিয়াছেন,—

হরিতকী পঞ্চ রসালবণা তুবরা পঞ্চম।
রুক্ষোষ্ণা দীপনী মেধ্যা বাতু পাকা রসায়নী।
চক্ষুষ্যা লঘুবায়ুগ্যা বৃহণী চানু লোমিনী।
শ্বাস কাস প্রমেহার্শঃ কুষ্ঠ শোথোদর কৃমীন।
বৈস্বর্য্য গ্রহণী রোগ বিষম বিষম জ্বরান্
গুল্মপ্লান তৃষাহৃদ্দি হিক্কা কণ্ঠ হৃদাময়ান।
কামলাং শূলমানাহং প্লীহানঞ্চ যকৃত্তথা।
অশ্মরীং মূত্র কৃচ্ছ্রঞ্চ মূত্রাঘাতঞ্চ নাশয়েৎ।

অর্থাৎ হরীতকী—লবণ রস ভিন্ন পঞ্চ রস যুক্ত অর্থাৎ মধুর, অম্ল, তিক্ত, কটু ও কষায় রস যুক্ত, তন্মধ্যে কষায় রসই প্রধান, রসনেন্দ্রিয়ের অনুভব যোগ্য। ইহা রুক্ষ, উষ্ণ বীর্য্য, অগ্নিদীপ্তিকর, লঘু, মেধাজনক,

মধুর বিপাক, রসায়ণ, চক্ষুর হিতকর, লঘু, আয়ুস্কর মাংস বর্দ্ধক, অনুলোমক এবং শ্বাস, কাশ, প্রমেহ, অর্শঃ কুষ্ঠ, শোথ, উদর, কৃমি, বিস্বরতা, গ্রহণী রোগ, বিবন্ধ, বিষম জ্বর, গুল্ম, উদরাগ্মান, পিপাসা, বমি, হিক্কা, কণ্ডূ, হৃদ্রোগ, কামলা, শূল, আনাহ, প্লীহা, যকৃৎ, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র এবং মূত্রাঘাত নষ্ট করে।

আয়ুর্ব্বেদের মূলসংহিতা—চরক এবং সুশ্রুত এবং অন্যান্য গ্রন্থগুলির উপরোক্ত শ্লোকের বিশ্লেষণ করিয়া হরীতকীর প্রয়োগ নানা রোগে যাহা দেখান হইয়াছে, তাহা বলা যাইতেছে—

রক্তার্শে—রক্তার্শের রোগীকে ভোজনের পূর্ব্বে গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন করাইবে (চঃ চিঃ ৯ অঃ)। (খ)

পক্কাতিসারে—উষ্ণ জলের সহিত হরীতকী চূর্ণ সেবন করিলে আম দোষ বিনষ্ট হয়, (চঃ চিঃ ৯ অঃ)।

পাণ্ডুরোগ—হরীতকী গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া গোমূত্রে পেষণ পূর্ব্বক কফ পাণ্ডু রোগীকে পান করিতে দিবে (চঃ চিঃ ২০ অঃ)।

উদর রোগে—রসায়ন বিধি নিষেধ অনুসারে উদর রোগীকে ক্রমশঃ সহস্র হরীতকী সেবন করাইবে। **ছর্দ্দিতে**—বমন নিবারণার্থে হরীতকী চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করাইবে। ইহাতে দোষ অধোগামী হইয়া বমন নিবৃত্তি হয়। (চিঃ ২৩ অঃ)

সুশ্রুত অর্শে—অন্তর্বলি অর্শে প্রতিদিন প্রাতে গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন করিবে, (চিঃ ৬ অঃ)॥ **গুল্মে**—গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন গুল্ম হিতকর (উঃ ৪২ অঃ)। **হিক্কায়**—গরম জলের সহিত হরীতকী চূর্ণ সেবন করিলে হিক্কা প্রশমিত হয় (উঃ ৫০ অঃ)। **শ্লীপদে**—গো এবং ছাগাদির মূত্রের সহিত হরীতকী চূর্ণ পান করিলে শ্লীপদ নিবৃত্তি পায়।

সন্নিপাত জ্বরে হরীতকী—ভাবপ্রকাশক বলেন—হরীতকী তিল তৈল ঘৃত কিংবা মধু—ইহাদের কোন একটি দ্রব্যের সহিত হরীতকী চূর্ণ লেহন করিতে দিবে, ইহা রুদ্দাহ সন্নিপাতে হিতকর (জ্বর চিঃ) **পিত্তশূলে হরীতকী**—ঘৃত কিম্বা গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন পিত্তশূলে হিতকর, (পিত্তশূল চিঃ)। **বাত রক্তে হরীতকী**—পাঁচটি কিংবা তিনটি হরীতকী সেবন পূর্ব্বক গুলঞ্চের ক্বাথ পান করিলে অতি উগ্র বাতরক্ত নিবৃত্তি পায় (চক্রদত্ত বাতরক্ত, চিঃ)। **মদাত্যয়ে হরীতকী**—মদাত্যয় রোগী হরীতকীর ক্বাথের সহিত মিশ্রিত দুগ্ধ পান করিবে হারীত, চিঃ ১৭ অঃ)। **রক্তপিত্তে হরীতকী**—বাসকের স্বরসে হরীতকী চূর্ণ ৭ বার ভাবনা দিয়া পিপুল চূর্ণ ও মধু সেবন করিলে রক্তপিত্ত জয় করা যায় (হারীত, চিঃ ১১ অঃ)। **বৃদ্ধি রোগে হরীতকী**—গোমূত্রে সিদ্ধ হরীতকী, এরণ্ড তৈলে ভাজিয়া কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণের সহিত চূর্ণ করিয়া সেবন করাইবে এবং ঈষদুষ্ণ জল পান করিতে দিবে। ইহা বহুদিনের বৃদ্ধি রোগের পক্ষেও হিতকর (চক্রদত্ত বৃদ্ধি চিঃ)। **চক্ষুরোগে হরীতকী**—হরীতকী ঘৃতে ভাজিয়া

চক্ষুর বহির্ভাগে লেপ দিবে, ইহা বিবিধ চক্ষু রোগে হিতকর (চক্রদত্ত—নেত্র রোগ চিঃ)। **আঙ্গুল হাড়ায় হরীতকী**—লৌহ-পাত্রে হরিদ্রার রসে হরীতকী পেষণ পূর্ব্বক তদ্দারা চিপ্প বা আঙ্গুল হাড়া পুনঃ পুনঃ প্রলিপ্ত করিবে (বঙ্গ সেন, ক্ষুদ্র রোগ চিঃ)

আমলকীর পরিচয়ে ঋষির উক্তি—

> হরীতকী সমস্বাত্রী ফলং কিন্তু বিশেষতঃ।
> রক্তপিত্ত প্রমেহঘ্নং পরং বৃষ্যং রসায়ন্।
> হন্তি বাতং তদম্লত্বাৎ পিত্তং মাধুর্য্য শৈত্যতঃ।
> কফং রুক্ষ কষায় ত্বাৎ ফলংধাত্র্যাস্ত্রিদোষজিৎ।
> যস্য যস্য ফলস্যেহ বীর্য্যং ভবতি যাদৃশং।
> তস্য তস্যৈব বীর্য্যেন মজ্জানমপি নির্দ্দিশেৎ।

অর্থাৎ আমলকী ও হরীতকী—উভয়ই তুল্য গুণ কারক, আমলকীর বিশেষত্ব এই যে, আমলকীর—রক্তপিত্ত ও প্রমেহ নাশক এবং অতিশয় পুষ্টিকারক ও রসায়ণ। আমলকী—অম্ল রস দ্বারা বায়ু, মধুর রস ও শীতলরস দ্বারা পিত্ত এবং কষায় রস ও রুক্ষ গুণ দ্বারা কফ নষ্ট করে, এজন্য আমলকী ত্রিদোষ নাশক।

চরক, সুশ্রুত এবং অন্যান্য চিকিৎসা গ্রন্থে আমলকীর ব্যবহার নিম্ন লিখিত রূপ পাওয়া যায়—

শ্বেতপ্রদরে—আমলকী বীজ উত্তম রূপে পেষণ পূর্ব্বক চিনি ও মধুর সহিত কিম্বা আমলকী চূর্ণ বা রস মধুর সহিত সেব্য (চরক, চিঃ ৩০ অঃ) **হিক্কায়**—আমলকী ও কয়েদ বেলের রস, পিপুল চূর্ণ ও মধু সহ হিক্কা রোগীকে সেবন করাইবে (চরক, চিঃ ২১ অঃ)। **বিসর্পজ্বরে**—গব্য ঘৃতে মিশ্রিত আমলকীর রস বিসর্পজ্বরে পান করিতে দিবে (চরক চিঃ ১১ অঃ)। **অর্শে**—আমলকী উত্তমরূপে পেষণ করিয়া কোনো মৃৎ পাত্রের অভ্যন্তরে লেপন করিবে। ঐ পাত্রে ঘোল রাখিয়া দিবে। অর্শ-রোগীকে ঐ ঘোল পান করিতে দিবে (সুশ্রুত চিঃ ৬ অঃ)। **বাতরক্তে**—পুরাতন ঘৃত আমলকীর রসের সহিত পাক করিয়া পানার্থ প্রয়োগ করিবে (সুশ্রুত চিঃ ৫ অঃ)। **প্রমেহে**—আমলকী প্রভৃতি ফল আহার করিবে (সুশ্রুত, চিঃ ১১ অঃ)। অধিক মাত্রায় আমলকীর রস পান করিলে প্রস্রাব জ্বালা নিবৃত্ত হয় (সুশ্রুত, চি, ৫৮ অঃ)। **কাসে**—কাসরোগী আমলকী চূর্ণ সহ দুগ্ধ পাক করিয়া ঘৃত সহ পান করিবে (বাগ্‌ভট, চিঃ ৩ অঃ)। কাস রোগে আমলকী চূর্ণ ২ তোলা, দুগ্ধ আধ-পোয়া, জল দেড়পোয়া, দুগ্ধাবশেষে নামা-ইয়া ছাকিয়া, উহাতে আধ তোলা গব্য ঘৃত মিশাইয়া সেব্য (বাগভট)। **রক্তপিত্তে**—ঘৃত ভর্জ্জিত শুষ্ক আমলকী কাঁজিতে পেষণ পূর্ব্বক মস্তকে প্রলেপ দিলে নাসিকা হইতে রক্তস্রুতি রুদ্ধ হয় (চক্রঃ, চিঃ)। **পিত্তশূলে**—পিত্তশূলী চিনির সহিত আমলকীর রস পান করিবে (চক্র শূল চিঃ)। **শীতপিত্তে**—শীতপিত্ত রোগী পুরাতন ইক্ষুগুড়ের সহিত আমলকী সেবন করিবে (চক্রদত্ত, চিঃ)। **মুত্র-রোগে**—আমলকী পেষণ করিয়া নাভির নিম্নদেশে প্রলিপ্ত করিবে (ভাব প্রঃ, চিঃ)। **যোনিদাহে**—আমলকীর রস চিনি সহ পেয় (ভাব প্রঃ)। **সরক্ত মুত্র-কৃচ্ছে**—ইক্ষুরস ও কাঁচা আমলকীর রস

সমভাগে মধু সহ পান করিবে (বঙ্গসেন)। **চক্ষু উষ্ণতায়**—সুপক্ক আমলকীর রস বিন্দু বিন্দু চক্ষুতে দিবে (বঙ্গসেন)। **শিরঃক্ষতে**—আমলকী, চিনি ও ঘৃতের সহিত পেষণপূর্ব্বক মস্তকে লেপন করিলে শিরঃক্ষত বিনষ্ট হয়, ইহা শিরঃপীড়ায়ও ব্যবহার করা যায় (ভাব প্রঃ, চিঃ)

বহেড়া সম্বন্ধে ঋষি বলিয়াছেন,—

বিভীতকং স্বাদু পাকং কষায়ং কফপিত্তনুৎ।
উষ্ণবীর্য্যং হিমস্পর্শং ভেদনং কাস নাশনম্।
রূক্ষং নেত্র হিতং কেশ্যং কৃমি বৈস্বর্য্য নাশনম্।
বিভীত মজ্জা তৃট্ ছর্দ্দি কফ বাত হরোলঘুঃ।

অর্থাৎ ইহা মধুর, বিপাক, কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, শীতস্পর্শ, ভেদক, রুক্ষ, চক্ষু কেশের হিতকর এবং কফ, পিত্ত, কাস, ক্রিমি ও বিস্বরতা নাশক। বহেড়ার মজ্জা—লঘু, কষায়, রস, মদকারক এবং পিপাসা, বমি, কফ ও বায়ু নাশক।

আয়ুর্ব্বেদে ইহার ব্যবহার এইরূপ—

কাসে—বহেড়া গব্য ঘৃতে মাখাইয়া গোবরের ঠুলির ভিতর রাখিয়া ঘুটের আগুণের উপর স্থাপিত করিবে। কিছু পরে উদ্ধৃত করিয়া ঐ বহেড়ার ছাল মুখে ধারণ করিবে। ইহা উৎকাসীর উত্তম ঔষধ (চক্র দত্ত, কাসচিঃ)। **শ্বাসে ও উৎকাসিতে**—বহেড়া চূর্ণ মধুর দ্বারা মর্দ্দন করিয়া সেবন করিলে প্রবল উৎকাসি ও শ্বাস নষ্ট হয় (চক্রঃ, কাস চিঃ) **হৃদস্পন্দনে**—বহেড়া চূর্ণ ও অশ্বগন্ধা চূর্ণ—পুরাতন ইক্ষুগুড় ও গরম জলের সহিত সেবন করিলে হৃদস্পন্দন প্রশমিত হয় (বঙ্গ সেন, বাতব্যাধি চিঃ)। **অশ্মরীতে**—আয়ুর্ব্বেদোক্ত কোনো-প্রকার মন্ত্রের সহিত বহেড়ার শাঁস পেষণ পূর্ব্বক পান করিলে মূত্র বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হয় এবং অশ্মরী প্রশমিত হয় (সুশ্রুত, উঃ, ৫৮ অঃ)। **শোথে**—বহেড়ার শাঁস পেষণপূর্ব্বক প্রলেপ দিলে ত্রিদোষজ শোথের দাহ ও বেদনা প্রশমিত হয় (চরক চিঃ ১৭ অঃ)।

এই হরীতকী, আমলকী ও বহেড়ার মত আমরা প্রত্যেক দ্রব্যই দেখাইতে পারি, যদ্দারা সকল প্রকার রোগের চিকিৎসাই করা যাইতে পারে। এইরূপ ভাবে এক একটী দ্রব্যের প্রয়োগে অনেক সময় বড় বড় ঔষধ অপেক্ষা শুভ ফলও ফলিয়া থাকে। গর্ভিণী চিকিৎসায়, শিশু চিকিৎসায় তো এইরূপ এক একটী ভেষজই প্রয়োগ করা আবশ্যক। নানাবিধ ঔষধ প্রদান করুন, কিন্তু স্ত্রী-রোগে অশোক, পাণ্ডু, কামলা প্রভৃতিতে গুলঞ্চ, কাসরোগে বাসক বা তজ্জাতীয় কোনো একটী দ্রব্য অনুপান স্বরূপ ব্যবস্থা করিতেই হইবে। এই শ্রেণীর অনুপানে মূল ঔষধ অপেক্ষাও অনুপানের দ্রব্যে অধিক ফল দর্শিয়া থাকে। দেশের চিন্তাশীল **চিকিৎসকগণের** দৃষ্টি এইরূপ চিকিৎসা-প্রবর্ত্তনার জন্য আমরা আকর্ষণ করিতেছি। এরূপ চিকিৎসা দরিদ্র বাঙ্গালা দেশে প্রবর্ত্তিত হইলে স্বল্পব্যয়ে চিকিৎসা করিতে পারা যাইবে, দেশবাসীর যথার্থ কল্যাণ সাধিত হইবে।

পাচনের চিকিৎসাও দেশের মধ্যে পুনরায় অধিক করিয়া প্রচলিত হওয়া কর্ত্তব্য। আয়ুর্ব্বেদ বলিয়াছেন,—

সর্ব্বৌষধেষু পাচনমৃষিভিঃ শ্রেষ্ঠমুচ্যতে।
যতো ব্যাধি প্রপীড়িতং স্বস্থং করোতি
সত্বরম্॥

অর্থাৎ রোগীগণ পাচন সেবন করিলে যেমন সত্বর স্বাস্থ্যলাভ করিয়া থাকে, অন্যান্য ঔষধে তত শীঘ্র ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তজ্জন্যই আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ মুনিগণ বটিকাদি সমস্ত ঔষধ অপেক্ষা পাচনের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়াছেন।

এই পাচন-দ্রব্য বিজ্ঞানের দৃঢ় ভিত্তির উপর নির্ম্মিত। আগে বৈদ্য-চিকিৎসার মধ্যে এই পাচনের প্রচলন বিশেষ ভাবেই ছিল, তাহার ফলে লোকের অর্থব্যয়ও অল্প হইত, অতি শীঘ্র সুফলও ফলিত। এখন দেশের রুচি-বিপর্য্যয়ে ইহাও নষ্ট হইবার মত হইয়া পড়িয়াছে। অনেক চিকিৎসকতো এখন পাচনের ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছুকই নহেন, অনেক গৃহস্থও আর পাচন প্রস্তুতের ঝঞ্ঝাট ভোগ করিতে চাহেন না। যাহা হউক গৃহস্থদিগের মধ্যে যদি সে ঝঞ্ঝাট ভোগ করিতে ইচ্ছা নাই করেন, তাহা হইলে দেশের চিকিৎসকগণ দেশের মধ্যে পাচনের পুনঃ প্রচলনের জন্য ঝঞ্ঝাটটা নিজে-দের হাতেই না হয় গ্রহণ করুন। তাঁহারা যে যে পাচনের ব্যবস্থা করিবেন, তাহা তাঁহারা দৈনন্দিন প্রস্তুত করিয়া রোগীকে প্রদান করুন, তাহার জন্য উপযুক্ত মূল্য গ্রহণ করুন। ফল কথা যে ভাবেই হউক পাচনের ব্যবস্থা বহুল ভাবে দেশে প্রচলিত হউক ইহাই আমাদের বক্তব্য।

বিজ্ঞান রহস্য।

(শ্রীসরোজকুমার মহলানবীশ)

মানব—সৃষ্টির আদিকাল হ'তেই অভি-সম্পিৎসু। 'আদম' ও 'ঈভ্' তাহারই মূল কারণ ব'লে আজ আমরা অশান্তি-সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছি। পাশ্চাত্য ইতিহাসের ইহাই নাকি গবেষণাপূর্ণ অকাট্য যুক্তি। ভগবৎ নিষেধ অগ্রাহ্য করায় আজ তাহারা আমাদের কাছে—তাঁদেরই উপযুক্ত বংশধর গণের নিকট ভ্রান্ত ব'লে প্রতীত। কথাটা যদি তাই হ'য়ে থাকে, তবে বড়ই আক্ষেপের বিষয়; ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা উর্ণনাভের সুতার ন্যায় জড়িয়ে পড়ি সত্য, কিন্তু ইহার অন্তঃপ্রবাহিত, স্বচ্ছ নির্ম্মল-ধারার যিনি স্বাদ পেয়েছেন, তিনি কি ক'রে বল্‌বেন—জ্ঞান আমরা চাই না, জ্ঞানের অমৃত ধারায় আমাদের কাজ নাই! পতঙ্গ অগ্নির চাকচিক্য দেখে পুড়ে মরে, বীরের হৃদয় সমর-বাদ্যে নাচিয়া উঠে, রণক্ষেত্র আপন শোণিতে রাঙ্গিয়ে তোলে, ইহাতে কি তা'দের সুখ নাই?

যে জ্ঞান কাহাও কাছে অমানিশার নিথর নিস্তব্ধ ভীতিপ্রদ দৃশ্য নিচয়ে পরিবৃত, আবার কাহারও কাছে শারদ-জ্যোৎস্নার প্রাণমাতান, বসন্তের সুরভি প্রসূনে, পাখীর মূর্চ্ছনায় আবেশময় ব'লে প্রতীয়মান হয়, সে জ্ঞান কি? সাধারণ ভাবে বলিতে হইলে এই বলিতে হয়—কোন কিছুর স্বরূপত্ব জানার নামই জ্ঞান। যেমন জল বলিলে এই বুঝি—দারুণ গ্রীষ্মে যখন কণ্ঠ শুষ্ক হয়ে মৃত-প্রায় হ'য়ে যাই, শীতল ক্রিয়ার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে উঠি, তখন যাহার স্নিগ্ধ পরশে আবার নূতন প্রাণ পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠি তাহাই জল। যাহার অভাবে মানবের আশা ভরসার-স্থল শস্যক্ষেত্র মরুভূমির ভীতিপ্রদ দৃশ্য নিচয়ে পর্য্যবসিত হয়, এমন কি যাহার অভাব ঘটিলে বিশ্বধ্বংসের পথে যেয়ে একটা হাহাকারের আর্ত্তস্বর দুনিয়ার মালিকের পদপ্রান্তে পৌছায়, ইহাইতো জল। তাই বুঝি আর্য্যঋষি ইহার নামকরণ করেছেন জীবন। এইতো গেল জল সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান।

ইহারই একটু উপর স্তরে বিজ্ঞান বিরাজিত। বিজ্ঞান কি ইহা বিংশ শতাব্দীর ছোট্ট ছেলেটিকেও ব'লে দিতে হয় হয় না। এখন ট্রামে আমরা নন্দন কাননে (Eden garden) যাই, বৈদ্যুতিক উত্তোলন যন্ত্রে (Lift) আমরা দালানের পর দালান ঘুরিয়া বেড়াই, ষ্টীমারে আমরা গঙ্গা পার হ'য়ে থাকি; বৈদ্যুতিক আলোতে পাখার হাওয়ায় যখন আয়েস করি, বিজ্ঞান যে তখন আমাদের ব্রেনে (Brain) আসর জমকাইয়া বসে। বিশ দিনের পথ যখন আমরা একদিনে চলে আসি, আশ্চর্য্যময়ী শশীমুখীর সুললিত কণ্ঠের সুমিষ্ট গীত যখন আমরা নির্জ্জন পল্লীর লতা-পাতা ঘেরা কুটীরে ব'সেও শুনতে পাই, বৈদেশিক অভিনেতা চার্লিচ্যাপলিনের অভিনয়-কৌশল যখন কর্ণওয়ালিস রঙ্গমঞ্চে প্রত্যক্ষ করিতে পারি, তখনই বুঝিতে আর বাকি থাকেনা বিজ্ঞান কি?

বিজ্ঞানের ধাতুগত অর্থ বিশেষরূপে জানা। যেমন জল Hydrogen ও oxygen এই মূল পদার্থদ্বয়ের সমন্বয়ে প্রস্তুত, ইহারই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান। ইহাই বৈদেশিক বিজ্ঞানের মূল সূত্র। কিন্তু এখানেই কি বিজ্ঞান সীমাবদ্ধ? এই বিজ্ঞানকেই কি আমরা বিজ্ঞান ব'লে গর্ব্ব অনুভব ক'রে থাকি? ইহাই যদি হ'য়ে থাকে, তবে বিজ্ঞান অবিজ্ঞান—বিজ্ঞান অপূর্ণ। বিহগের কূজন, ফুলের হাসি, সমীরের বুকভরা স্নেহ, কাহার আশীষ সিঞ্চন ক'রে দেয়! উষা অলক্ত রাগে রঞ্জিত হয়ে নিসর্গের সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডারটুকু লুঠে নিয়ে প্রতিদিন কা'র আদেশে আমার দ্বারে দাঁড়িয়ে থাকে? পূর্ণিমার রজতশুভ্র চন্দ্রমা আমার কুটীর খানি কা'র আদেশে জোছনায় সিক্ত ক'রে দিয়ে হাসতে হাসতে পশ্চিম গগনের কোলে ঢলিয়ে পড়ে। গোলাপ-টগর-মল্লিকা কাহার সৌরভের কণা পেয়ে আজ তাহারা বিলাসী লক্ষ্মীর বরপুত্রের প্রমোদ কাননে সাদরে স্থান পেয়েছে? এই খানেই বৈদেশিক বিজ্ঞান চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে যায়। বিজ্ঞানের আলো সেখানে-যেখানে ব্রহ্মাদি দেবারাধ্য সেই চন্দন চর্চ্চিত চরণযুগলের সন্ধান মেলে—যখন সেই চরণ-রেণু মস্তকে ধারণ করিয়া নয়নযুগল প্রেমাশ্রু পরিপ্লুত হইয়া উঠে, তখন মান

অভিমান, অহঙ্কার দূরে পালিয়ে যায়। তখন শুধু এক অনির্ব্বচনীয়, স্বর্গীয়, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ দেহমনকে মাতিয়ে রাখে। যে মহাজ্ঞানে সেই মহানকে জানা যায়—তাহাই প্রকৃত বিজ্ঞান।

বিজ্ঞানের ভিত্তি কোথায়? সমস্যা-সমাধানই বিজ্ঞানের ভিত্তি। লালসায় ইন্ধন যোগানই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের চরম ফল। আমরা হিন্দু; আমাদের প্রতি শিরায় উপশিরায় আর্য্য শোণিত প্রবাহিত। ইন্ধন যোগান তো আমাদের ধর্ম্ম নহে! আমরা যে অমৃতস্য পুত্র। আমরা যে বজ্রনির্ঘোষে শুনতে পেয়েছি—

"সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য
মামেকং শরণং ব্রজ—"

আমরা তো লালসায় ইন্ধন চাইতে পারিনা। আমরা চাই নির্ব্বান—আমরা চাই মুক্তি। আমাদের বিজ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তি হ'বে—'আপ্তবাক্য'—উপায়—যোগ। আর সেই বিজ্ঞানসেবী মুনি ঋষিদিগকে আমরা শুধু ফলমূলখেকো বলিতে পারি না। তাঁহাদিগকে আমরা ভাবি দেবতা-শ্রেষ্ঠ। তাই বুঝি ভগবান বাসুদেব ভৃগুপদ চিহ্ন লাঞ্ছিত।

Hydrogen ও oxygen আমার খেলার সাথী Iodine ও Bromine আমার হৃদয় সর্ব্বস্ব; Electricity আমার আঁধার ঘরের আলো, Laboratory আমার বৈঠক খানা। কিন্তু ওরা তো আমার বুক ফুলিয়ে ব'লে দিতে পারেনা যে তুমি বৈজ্ঞানিক—তোমার বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট আছে। ওরা তো আমায় ব'লে দেয়না যে জ্ঞান পেয়ে কুবের ভিখারী, দেবাদিদেব মহাদেব শ্মশান-বাসী, রাজা সর্ব্বত্যাগী—সে জ্ঞানের খানিকটুকু আমায় দিতে পারে। আমরা গোষ্পদ, মহাসমুদ্রের সঙ্গে আমাদের তুলনা হ'বে কেন? আমরা তো শুধু বৈজ্ঞানিকের পরিচ্ছদে আসর জমকাইয়া বিজ্ঞানের অভিনয় ক'রে থাকি মাত্র। অভিনয়ে হয়তো কেহ লোক সমাজের মনতুষ্টি ক'রে সুনাম অর্জ্জন করিতে পারি! সেতো হলো আমাদের ব্যবসাদারী জ্ঞান! এই জ্ঞান নিয়েই তো আমি ব'লতে পারিনা আমি বিজ্ঞান জানি। যখন যথার্থ জ্ঞানের দুয়ারে আমি মাত্র দাঁড়াতে পারব, তখনই দেখবো আমার অহমিকা জ্ঞান, ঘুচে গিয়ে এক বিমল জ্যোতিতে আমি উদ্ভাসিত হ'য়ে গেছি। তখন তো আমি বলতে পারবো না আমি X Roy দিয়ে Dishcation দেখবো, আমি টাইটেলিক গড়্‌বো, আমি এরোপ্লেনে হাওয়া খাবো। তখন শুধু এই কথাই মনে হ'বে "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।" ইহাই তো হলো প্রাচ্যের মূলমন্ত্র। সে জ্ঞানের রহস্য উদ্‌ঘাটনের শক্তি টেলীস্কোপ বা মাইক্রোস স্কোপের নেই, ওরা শুধু আমাদের দৃষ্টিশক্তি—ইন্দ্রিয়গুলির শক্তি বাড়িয়ে দিয়ে ইহাদের শক্তির অপচয় ক'রে থাকে। আমরা চাই—অন্তর্দৃষ্টি। ইন্দ্রিয় বৃত্তি নিরোধ ক'রে আভ্যন্তরীন অমূল্যরত্নের সন্ধানই আমাদের ইপ্সিত। ইহাইতো যোগ! এই যোগ সাধনার চরমফল আপ্তবাক্য লাভ। আপ্ত বাক্যের মানে মানব হৃদয়ে ঈশ্বরের বাণী। যখনই আমি জ্ঞানময়ের আশ্বাস বাণী শুনতে পেলাম, তখন আমার স্বরূপত্ব জ্ঞানের বাকী

রইল কি? আমি যে তখন স্পর্শ মাণিকের পরশে খাঁটী সোণা হয়ে গেছি। আমি যে তখন ভাবি—

"অহং ভোজনং নৈব
ভোজ্যং ন ভোক্তা—"

ইহার জন্যই রাজা সর্ব্ব বনবাসী, গৃহী সর্ব্ব-ত্যাগী। যাহাদের ক্রোধে প্রলয়ের বিভি-ষিকা সঞ্চার করে, নিঃশ্বাসে রাজা রাজ্য ভ্রষ্ট হন, অভিসম্পাতে ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব ঘুচে যায়, তা'রা আজ কাননচারী—ফলমূল খেকো। তাই ইংরেজী সুরে বলতে হয়—

"Plain living and high thinking is the made of our life." তখন আর পার্থিব ভোগ বিলাস বা তাহার সাধন জ্ঞান বিজ্ঞানে প্রবৃত্তি হয় না। মন তখন যাহাকে ভোগ করিয়া তৃপ্ত হয় না, সেই সকল আনন্দের মূল কারণের চরণ কমলে লুব্ধ মধুকরের ন্যায় বদ্ধ হইয়া যায়। সে মধু ত্যাগ করিয়া উড়িবার আনন্দও সে চায় না।

——

'গুলে গোল'।

(শ্রীরাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ।)

'গুলে'র কথা অনেকেই জানেন। আগে গুল অনেকেই দেখিয়াছেন ও তাহার মানব দেহের উপর উপকারিতার কথাও অবগত আছেন। অধুনা গুল, দ্বারা বিষচিকিৎসা একবার উঠিয়া গেলেও মাঝে মাঝে গুল-মাহাত্ম্যের পরিচয় পাওয়া যায়, সে কথা সর্ব্ব সাধারণ সমক্ষে প্রমাণ করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

গুলের কথা কহিব কি, এখন সবই গোল হইয়া গিয়াছে। আগে প্লীহা, বাতাদি গুরুতর রোগে প্রায় সকলকেই হস্ত পদ বা পৃষ্ঠদেশে গুল লইতে দেখিয়াছি। হস্ত পদাদির নিকৃষ্ট স্থানে লোহা পোড়াইয়া সে স্থানে হরিদ্রা খণ্ড রাখিয়া ঘা করিতে হয়, সে ঘায়ের স্থানে নিম কাঠের বা হরিদ্রা খণ্ডের ক্ষুদ্র গুটি বসাইয়া দিতে হয়। নিমের গুটি হরিদ্রা গুটীতে ঘায়ের স্থানটা গর্ত্ত হইয়া যায়। কিছু-দিন নিয়ত সে স্থানে ঐ গুটী বসাইয়া রাখিতে হয়। পরে অন্য গুটী দিতে হয়। তাহা দিয়া প্রতিদিন প্রচুর পূঁয নির্গত হয়। ঐ পূঁয বাহির হওয়ার দরুণ দেহের যত, দূষিত পদার্থ বাহির হইয়া শরীরটা ঝরঝরে হয়। তদ্দরুণ দৈহিক অবসাদ দূর হইয়া শরীর পাতলা হয়। দেশে এরূপ গুল লইবার রীতি ছিল। এই অবস্থায় শরীরে পূঁয়ের গন্ধ হয় বলিয়া তাহা নিত্য অন্ততঃ দুইবার করিয়া ধৌত করিয়া পরিষ্কার রাখিতে হইত। কেহ কেহ তাহাতে দুর্গন্ধ না হইতে পারে তজ্জন্য আতর, গোলাপ ব্যবহারও করিতেন।

এখন ভদ্রলোকেরা গুলটা প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছেন। সাধারণ দরিদ্র লোকেরা কেহ কেহ গুল দিয়া থাকে, তাহাতে তাহারা প্রচুর উপকারও পাইয়া থাকে। দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিতে কবিরাজেরাও এরূপ গুলের ব্যবস্থা দিতেন এবং তদ্বারা রোগীরা প্রভূত উপকার পাইত। প্লীহা ও বাত রোগে গুল অনেক উপকার দিয়া থাকে। তা' ছাড়া চক্ষু রোগেও গুলের উপকারিতার কথা শুনা যায়। অন্যান্য বহুবিধ রোগে গুলের ব্যবস্থা শুনা যাইত। গুলে যত বেশী পূঁয ধরে, সেইস্থানে সত্বর তত বেশী স্থায়ীরূপে উপকার হয়। প্লীহা রোগের অবস্থায় বালক, বালিকা-দিগকে গুল লইতে দেখা যাইত। এখন গুলের তেমন প্রাদুর্ভাব দেখা যায় না।

বাঙ্গালার জল বায়ুতে আগে গুল সহ্য হইত। প্রথমে দেহের স্থান-বিশেষকে উত্তপ্ত লৌহ শলাকা দ্বারা পোড়াইয়া দিলে তাহাতে যন্ত্রণা হয় ও সে স্থান পাকিয়া গলিয়া বিলক্ষণ যন্ত্রণা প্রদ করিয়া তোলে, ক্রমে তাহাতে গুলী বসাইয়া দিলে ঝরিতে আরম্ভ হইলে আর যন্ত্রণা থাকে না, কিন্তু আবার পূর্ণিমাদি জোয়ারের তিথিতে কিছু কিছু করিয়া যন্ত্রণা হইয়া থাকে। ভদ্রলোকেরা গুলকে বড় কষ্টপ্রদ বলিয়া মনে করেন, ফলে গুল তেমন কোন কষ্ট প্রদান করে না, পরে উহা সহ্য হইয়া যায়। দেহের যত দূষিত রক্ত গুলের ভিতর দিয়া পূযাকারে বাহিরে আসিয়া পড়ে। এইগুলকে দীর্ঘকাল দেহে রাখিলেই বেশী উপকার হয়। এরূপ ভাবে দীর্ঘকাল গুল দেহে রাখিলে বিশেষ কষ্টও নাই, সঙ্গে সঙ্গে উপকারও হইয়া থাকে। রোগের যন্ত্রণা হইতে গুলের যন্ত্রণা বেশী নহে। এইরূপ উপকারী গুলকে পুনরায় প্রবর্ত্তন করিতে পারিলে ভাল হয়। এখন হয়ত সর্ব্ব প্রকারের চিকিৎসকেরা গুল দেওয়া সম্বন্ধে গোল করিয়া তাহার প্রচলনে বিরোধী হইবেন।

চক্ষুরোগে সাধারণতঃ ঘাড়ে বা কর্ণে গুল দেওয়া হইত। বাত রোগে ও প্লীহার হস্ত বা পদে প্রস্রাবাদি রোগে কখন কখন উরুতে গুল দেওয়ার ব্যবস্থা হইত। প্লীহা ও বাত রোগে সময় সময় পৃষ্ঠে গুল দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। কর্ণ ও ঘাড়ে মস্তিষ্ক রোগে গুল দেওয়া হইত। এই চিকিৎসায় ব্যয় ছিল না, অথচ উপকারিতা অল্প ছিল না। এইরূপ সুলভ চিকিৎসা উঠিয়া যাওয়ায় দেশের অপকার হইয়াছে। আহারাদিতেও কোন নিষেধ-বিধি কতক গুলি দ্রব্যের উপর ছিল, যাহা খাইলে দেহে বাতাধিক্য ঘটিতে পারিত না।

প্রতিবাদ।

(শ্রীঅজিত শঙ্কর দে)

মাননীয় "আয়ুর্ব্বেদ"-সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

মহাশয়,

আপনার বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার পত্রিকায় কবিরাজ নীলকান্ত রায় কবিরত্ন লিখিত "প্রাচ্য ও প্রতীচ্য" প্রবন্ধ দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। আশ্চর্য্যের কারণ এই যে, এরূপ একটী মিথ্যা যুক্তি পূর্ণ প্রবন্ধ আপনার "আয়ুর্ব্বেদে' স্থান পাইয়াছে। লেখক মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া অনধিকার চর্চ্চা করিয়াছেন; কারণ হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে তাঁহার কোনও জ্ঞান নাই। ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে। "The greatest fool is he, who doest'not know that he himself is a fool." বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, কবিরত্ন মহাশয় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাশাস্ত্রে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হইয়াও সে সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বালোচিত আচরণ করিয়াছেন।

প্রকৃতি উচ্চ শিক্ষিত কত কবিরাজ ও এলোপ্যাথগণ উচ্চ কণ্ঠে হোমিওপ্যাথির কত প্রশংসা করিয়াছেন ও করিতেছেন, আর আপনাদের "প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের" লেখক মহাশয় স্পষ্টই বলিতেছেন যে,হোমিওপ্যাথিতে রোগ আরাম হয় না। হোমিওপ্যাথিতে রোগ আরাম হয় কি না, তাহা জগতের সকল দেশের লোকই জানেন এবং কবিরত্ন মহাশয় যদি নিদ্রিতাবস্থায় গৃহে বসিয়া না থাকেন, তিনি ও জানেন। তিনি তাঁহার প্রবন্ধে চক্রপাণি ও সুরেন্দ্রের কথোপকথনচ্ছলে চক্রপাণির মারফত হোমিওপ্যাথির সম্বন্ধে তাঁহারা যে সমস্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সকল গুলির প্রতিবাদ করিলে অপনার "আয়ুর্ব্বেদের" সকল পৃষ্ঠাগুলিই পূর্ণ হইয়া যাইবে। প্রতিবাদ করিলেই বা ফল কি হইবে? কবিরত্ন মহাশয়ের হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে যদি কোন জ্ঞান থাকিত তাহা হইলে তাঁহার সহিত বাদানুবাদ করিতাম। বাদানুবাদ করিবার পূর্ব্বে হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে জ্ঞানের জন্য তাঁহাকে দুইখানি পুস্তক পাঠ করিতে উপদেশ দান করি। একখানি, হোমিওপ্যাথির আবিষ্কর্ত্তা মহাত্মা হ্যানিম্যান প্রণীত অর্গ্যানন (Organon of medicine), আর একখানি মহানুভব কেন্ট প্রণীত হোমিওপ্যাথিক দর্শন Lcture on Homoeopathic Philosophy)। এই দুইখানি পুস্তকে সম্যক্ উপলব্ধি না করিয়া তিনি আর কখনও যেন হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে আলোচনা না করেন। তাহা হইলে তাঁহাকে অনেক অবমাননা সহ্য করিতে হইবে। তাঁহার "প্রাচ্য ও প্রতীচ্য" প্রবন্ধ যে তাঁহার কত নির্য্যাতনের কারণ হইবে তাহা তিনি নিজেই বুঝিতে পারিবেন। যাহা হউক তাঁহার কয়েকটী উক্তির সংক্ষেপে প্রতিবাদ করিতেছি।

১। চক্রপাণি মারফত তিনি সুরেন্দ্রকে প্রশ্ন করিতেছেন, "যাঁহারা ভাবুক, যাঁহারা চিন্তাশীল, তাঁহারা কি উহাতে মুগ্ধ না উহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে চান?" তাহার উত্তরে আমি বলি যে, হাঁ, যাঁহারা সৎবিষয়ে ভাবিতে বা চিন্তা করিতে জানেন, তাঁহারাই হোমিওপ্যাথির নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে পারিয়াছেন।

২। তিনি লিখিতেছেন, "হোমিওপ্যাথিক ঔষধ এত সূক্ষ্মতম সূক্ষ্মঅংশে বিভাজিত যে, তাহার ক্রিয়া শরীরের উপর প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব।" প্রকাশ পাওয়া সম্ভব কিনা, আমি কবিরত্ন মহাশয়কে তাঁহারই শরীরের উপর পরীক্ষা করিয়া প্রমাণ দেখাইয়া দিব বলিয়া আহ্বান করিতেছি।

৩। সুরেন্দ্রের বন্ধুগণ মারফত তিনি বলিয়াছেন, "জার্ম্মান ও আমেরিকানগণ যখন হ্যানিম্যানের মতের পরিপোষক, তখন কি উহাতে ভুল আছে?" তাহার উত্তরে আমি বলি যে, হ্যানিম্যানের সমস্ত সূত্রগুলিই যে যুক্তি মূলক তাহা কবিরত্ন মহাশয় অর্গ্যানন পাঠেই বুঝিতে পারিবেন।

৪। কবিরত্ন মহাশয় তাঁহার শেষ অধ্যায়ে বলিয়াছেন যে, "ঔষধ বিনাও রোগ আরোগ্য হয় এবং হোমিওপ্যাথগণ পথ্যের উপর বেশী নির্ভর করেন।" তাহার উত্তরে আমি লিখি যে, কতক রোগ—বিনা ঔষধেও আরোগ্য হয়, কিন্তু প্রাচীন রোগ তাহা হয় না। পথ্যের বিচার কি কেবল হোমিওপ্যাথরাই করেন? কবিরাজ কিংবা এলোপ্যাথগণ কি সে সম্বন্ধে বিচার করেন না? আমাদের কবিরত্ন মহাশয় কি পেটেণ্ট ঔষধের বিজ্ঞাপন লেখার ন্যায় "স্নান, ভোজন পানের কোন ও নিয়ম নাই"—ইত্যাদি যথেচ্ছাচারিতা সূচক পেটেণ্ট কথাগুলি ব্যবহার করেন? তাহা যদি করেন, তাহা হইলে কবিরত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক আপনাদের অন্যান্য কবিরাজ মহাশয়গণের অন্নের পথ বন্ধ হইবে।

স্বর্গীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

[কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত ভিষগরত্ন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রী এল,এ, এম, এস ; এচ এম্ বি]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

জীবনে আর একবার মাত্র তাঁহার পদধূলি পাইয়াছিলাম। সে আজ প্রায় দেড় বৎসর পূর্ব্বের কথা। সেবার রায় বাহাদুর ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের কন্যার বিবাহ উপলক্ষে। বিবাহের দিন সন্ধ্যার সময় আশু বাবু তাঁহার দুই পুত্র শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ ও শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদের সহিত দীনেশ বাবুর বাড়ীতে আসিলেন। দীনেশ বাবু তাঁহাকে

কিছু খাইতে অনুরোধ করিলে তিনি শরীর ভাল নাই বলিয়া আপত্তি করিলেন। দীনেশ বাবু বলিলেন,—কি হইয়াছে? তিনি বলিলেন পেটের গোলমাল হইয়াছে। দীনেশ বাবু তখনি বলিয়া বসিলেন,—তা'তে কি হয়েছে? আপনি খান, আমি ঔষধ দিব। কিছু মিষ্টান্ন খাইলে পর আশু বাবু ঔষধ চাহিলেন। দীনেশ বাবু তখনি তাঁহার এক পুত্রের দ্বারা দুইটী ঔষধ পূর্ণ শিশি আনাইলেন একটীতে 'মহাশঙ্খবটী' অপরটীতে 'বজ্রক্ষার।' আশু বাবুকে দীনেশ বাবু কিছু বজ্রক্ষার খাইতে দিলেন। আশুবাবু খাইয়াই বলিলেন, —এ কোন্ কবিরাজের ঔষধ? তিনি বলিলেন "এ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট কবিরাজ সত্যচরণ সেন মহাশয়ের ঔষধ। আমি তাঁর কাছ থেকে এই দুই শিশি ঔষধ লইয়া আসিয়াছি,—এই তাঁর ছেলে, এও কবিরাজ।" তখনি আশু বাবু আমাকে তাঁহার নিকটে ডাকিলেন, আমি তাঁহার কাছে গিয়া পদধূলি লইয়া দাঁড়াইতেই বলিলেন,—এ ঔষধের নাম কি? আমি বলিলাম বজ্রক্ষার, তিনি বলিলেন, এতে কি আছে? আমি বলিলাম,—সোরা ও ফট-কিরি। আমার কথা শুনিয়াই তিনি লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন—আমি তো ঠিক ধরিয়াছি; এতে সোরা আছে, তবে তো এ বড় উপকারী। এর পর আরও দুচারটা প্রশ্ন আমাকে করেছিলেন। তারপর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত রমা প্রসাদ বাবু উক্ত দুই শিশি অর্দ্ধেকটা করিয়া ঔষধ লইয়া যাইলেন। এই দুই বার মাত্র আমি তাঁর পদধূলি পাইয়া ধন্য হইয়াছি। আজ মনে হইতেছে, তিনি আরও কিছু দিন কেন থাকিলেন না?

আশু বাবু যে কিরূপ নির্ভীক লোক ছিলেন, তাহা সকলেই জানেন। এই সে দিন 'কনভোকেশনের' পর লর্ড লিটনের সহিত তাঁহার যে পত্র ব্যবহার হইয়াছিল, তাহাতে তিনি কিরূপ নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা সকলেরই মনে আছে। একবার লর্ড কর্জ্জন যখন তাঁহাকে বলেন—"আপনার মাকে বলিবেন, প্রধান রাজ প্রতিনিধি তাঁহাকে আদেশ করিতেছেন যে, তাঁহার পুত্রকে যাইতে হইবে।" তদুত্তরে আশু বাবু বলিয়াছিলেন,—ভারতের বড় লাট কিম্বা তদপেক্ষা কোন উচ্চতর ক্ষমতাশালী এমন কোন লোকই এ পর্য্যন্ত কেহই জন্মায় নাই যিনি আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বা তাঁহার মাতার নিকট হইতে তাঁহার পুত্রকে লইয়া যাইতে পারেন। সোজাভাবে সকলকেই এরূপ উত্তর দিতে কখন আশুবাবু পশ্চাৎপদ ছিলেন না। আমি তাঁহার জীবনী লিখিতে বসি নাই, অনেক যোগ্যব্যক্তি যাঁহারা তাহার সংস্পর্শে বহুদিন কাটাইয়াছেন, সে কার্য্য তাঁহারাই করিবেন।

আয়ুর্ব্বেদের উপর আশুবাবুর প্রগাঢ় অনুরোগ ছিল। বাঙ্গালা ভাষাকে তিনি যেরূপ বিশ্ববিদ্যালের সর্ব্ব শীর্ষে স্থান দান করিয়াছিলেন, সেইরূপ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা যাহাতে চিকিৎসাজগতে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিতে পারে, তাহার জন্যও তিনি বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন। তিনি মনে প্রাণে জানিতেন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাই যে এদেশবাসীর আদি চিকিৎসা, তাহা দেশবাসী এক দিন না

এক দিন বুঝিতেই পারিবেন। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ইহার বোর্ড অব ট্রষ্টির প্রেসিডেণ্ট হইয়াছিলেন ও জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত শতকাজের মধ্যে থাকিয়াও ইহার কাজ করিয়া গিয়াছেন। এই অষ্টাঙ্গ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর ইহা তিনি দেখিতে আসেন এবং ইহার কার্য্য-প্রণালী দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া মন্তব্য যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"আমি আয়ুর্ব্বেদ কলেজ পরিদর্শন করিয়া অতীব আনন্দিত হইলাম। কবিরাজ যামিনীভূষণ রায়ের কর্ম্মদক্ষতায় এবং উৎসাহে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞান-শাস্ত্রের আবিষ্কৃত বিবিধ তত্ত্ব ও দ্রব্যসম্ভারের সাহায্যে ভারতের প্রাচীন চিকিৎসা বিদ্যার অনুশীলন ও উৎকর্ষ সাধন করাই এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। এক একজন অধ্যাপকের প্রতি বিষয়-বিশেষের অধ্যাপনার ভার অর্পিত হইবে এবং তিনি সেই বিষয়ের শাস্ত্রাংশ যোগ্যাকরণ পূর্ব্বক অধ্যাপন করাইবেন। রসশাস্ত্র পদার্থবিজ্ঞান বনৌষধি বিজ্ঞান, শারীর ক্রিয়া তত্ত্ব, অঙ্গ বিনিশ্চয় বিদ্যা, কায় চিকিৎসা, শল্যশালাক্য চিকিৎসা ও প্রসূতিতন্ত্র চিকিৎসা বিদ্যা—এই আটটী শাখার জন্য আট জন অধ্যাপক নিযুক্ত থাকিবেন। একটী দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। চিকিৎসালয়ে সমাগত রোগীগণের ঔষধসাধ্য এবং শস্ত্রসাধ্য উভয় রোগের চিকিৎসা বিনামূল্যে নির্ব্বাহ করা হয়। চিকিৎসার্থ ব্যবহৃত বৃক্ষ গুল্ম লতাদির পরিচয়ের সুবিধার জন্য ভেষজ পরিচয়াগারের প্রতিষ্ঠাকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। দুর্লভ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহপূর্ব্বক ঐ সকল গ্রন্থের প্রামাণ্য বিশুদ্ধ সংস্করণ মুদ্রিত করাও উদ্‌যোক্তৃদিগের অভিপ্রেত। এই বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠেয় বিবিধ চিত্তাকর্ষক বিষয়ের মধ্যে আমি একটীর মাত্র উল্লেখ করিলাম। অনুষ্ঠেয় বিষয়গুলি বিশেষ হিতকর, সুতরাং এই বিদ্যালয় জনসাধারণের এবং রাজসরকারের নিকট হইতে বিশেষ আনুকূল্য লাভের যোগ্য। ভয়াবহ প্রতিদ্বন্দ্বী সত্ত্বেও এতদ্দেশীয় চিকিৎসা-সমালোচকগণ যদি দেশীয় চিকিৎসাবিদ্যা আলোচনা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের নিশ্চয় প্রতীতি জন্মিবে যে, এই শাস্ত্র বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা কেবল অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান মূলক নহে। ভারতীয় সুতীক্ষ্ণ ধী সম্পন্ন মনীষীগণের যুগযুগান্তরের অর্জ্জিত ভূয়োদর্শন এবং অভিজ্ঞতা যে চিকিৎসা শাস্ত্রে সঞ্চিত রহিয়াছে, তাহাকে আমরা কদাপি অবজ্ঞা করিতে পারি না। এক্ষণে যে পন্থা অনুসরণ করিতে হইবে বলিতেছি—ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্র আয়ুর্ব্বেদ উত্তরোত্তর উন্নতির অযোগ্য—মৃত বলিয়া ভাবিও না, কিন্তু উত্তরোত্তর উপচীয়মান বিজ্ঞান শাস্ত্রের মত যাহাতে ইহারও পরিপুষ্ট সাধিত হয়, যত্নের সহিত তদ্রূপ অনুষ্ঠান কর। এই কলেজের গৃহ, আতুর-নিবাস, গ্রন্থাগার, প্রদর্শনী ও কর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠার জন্য যে অত্যাবশ্যক অর্থের প্রয়োজন, তাহা সংগৃহীত হইয়া যাইবে।

(স্বাঃ) শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়,
২২শে জুলাই ১৯১৬।"

আজ নয় বৎসর পূর্ব্বে আশুবাবু যে ভবিষ্য বাণী করিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ সাধিত না হইলেও অনেকাংশে সাধিত হইয়াছে বলিতে হইবে। এই আয়ুর্ব্বেদ কলেজ করপোরেশন হইতে বার্ষিক ৩৫০০ টাকা সাহায্য পাইয়া থাকে, ইহা ভিন্ন ইহার বাড়ী প্রস্তুতের জন্য ১বিঘা ১১কাঠা জমি মিউনিসি-প্যালিটি দান করিয়াছেন। আশুবাবুর ইচ্ছা ছিল এই কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত করেন। আশুবাবুর অনুরক্ত দেশবাসীগণ অগ্রণী হইয়া তাঁহার অসমাপ্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার অঞ্জলি প্রদান করুন ইহাই প্রার্থনা। পরপার হইতে তিনি সকলকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।

পরম পূজ্যপাদ মহাত্মার উদ্দেশে আজি আমি কবি অমরেন্দ্রনাথের সহিত হৃদয়ের অঞ্জলি প্রদান করিয়া বলিতেছি,—

বাঙ্গালার সিদ্ধপীঠে হে শব সাধক!
তব তরে অশ্রুঝরে সারা বাঙ্গালার।
বিল্বদল গঙ্গাজলে পূজিতে তোমারে
পাইবে না অভাগা বাঙ্গালি,—তাই আজ
তিল তুলসী গঙ্গোদকে করিছে তর্পণ
ভীষ্ম-পিতামহ জ্ঞানে তোমারে সকলে।"

অপ্রকাশিত প্রাচীন পুঁথি†

দ্রব্যগুণ সংগ্রহ।

(অধ্যাপক শ্রীজিতেন্দ্র নাথ সেন এম-এ)

অগুরু আগরাই চন্দন+ তিক্ত, উষ্ণ, কটু, (লেপে রুক্ষ)। ব্রণ কফ, বায়ু, কান্তি, মুখ-রোগ, চক্ষু ও কর্ণ রোগ নাশক। মাত্রা ১ মাষা হইতে ২ মাষা।

অগ্নিজার।—কটু, উষ্ণ। কফ, বায়ু সন্নি-পাত, শূল ও শীতরোগ নাশক। পিত্তপ্রদ।

অগ্নি দমণী, শোলা। কটু, উষ্ণ, রুক্ষ। বাত, কফ, গুল্ম ও প্লীহা নাশক।

অঙ্কোট, আঁকোড়। কটু, স্নিগ্ধ। বিষ-লুতাদি দোষ নাশক, কফ বায়ু নাশক, মূত্র শুদ্ধিকারক, রেচক। মাত্রা—২ তোলা।

ফল।—শীতল, স্বাদু, শ্লেষ্ম নাশক, গুরু,

---

† এই অপ্রকাশিত প্রাচীন পুঁথি সিটি কলেজের কেমিষ্ট্রির অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র নাথ সেন মহাশয় সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন বলিয়া তাঁহারই নাম প্রবন্ধে দেওয়া হইয়াছে। ইহা তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষের সংগৃহীত। আঃ সাং।

বলকারক, ধাতুপোষক, বিরেচক, বাত, পিত্ত, দাহ, ক্ষয় দুষ্টরক্ত নাশক।

অজগন্ধা, বলযমানী, অজমোদা।—কটু, উষ্ণ। বাত, গুল্ম, উদর রোগ, ব্রণ ও শূল নাশক, নেত্র রোগ নাশক, কৃমিঘ্ন, বসন্ত রোগ নাশক। মাত্রা ২ মাষা।

অজশৃঙ্গী, গাড়র শৃঙ্গী অর্থ শিঙ্গিমাষ, জিয়ল। কটু, তিক্ত, কফ, অর্শ, শূল, শোথ, শ্বাস, হৃদ্রোগ, বিষরোগ, কাস ও কুষ্ঠ রোগে হিতকারী। মাত্রা ২ তোলা।

অণ্ড।—স্বাদু, কটু, রুচি-শুক্রকারক। বাত শ্লেষ্মা নাশক।

অঞ্জী, পেয়ারা। শীতল, স্বাদু গুরু, বায়ু পিত্ত, রক্ত, ক্রিমি, শূল, হৃৎপীড়া, কফ ও মুখরোগ নাশক।

ফল।—তিক্ত, উষ্ণ, কটু, কফ, বায়ু নাশক, রুচীকারক।

অতসী।—উষ্ণ, তিক্ত। বাতহারক, শ্লেষ্মা পিত্ত কারক; বায়ু কফ, কাস নাশক মাত্রা ২ তোলা।

অতিবলা, পীতবর্ণ বেড়েলা।—তিক্ত, কটু, বাত, কৃমি নাশক। দাহ তৃষ্ণা তৃষ্ণা বিষ ও ছর্দ্দি নাশক। মাত্রা ২ তোলা।

অতিমুক্ত, তিনিশ বৃক্ষ।—কষায়, শীতল রস নাশক, পিত্ত, দাহ, জ্বর, উন্মাদ, হিক্কা ও সর্দ্দি নাশক। মাত্রা ১ তোলা।

অতিবিষা। পাচক, গ্রাহী। কফ-পিত্ত জ্বরনাশক। আমাতিসার নাশক, কাস, বিষ ও ছর্দ্দিনাশক, কৃমিনাশক। মাত্রা ৩ রতি।

অত্যল্পপর্ণী লতাবিশেষ। বহ্নি পূরণ। প্লীহনাশক, বাতনাশক, অগ্নি রুচিকারক, শুষ্ক শ্লেষ্মা রোগ নাশক।—মাত্রা ৩ মাষা।

অনন্তমূল।—মলবদ্ধকারী, রক্তপিত্তনাশক মাত্র ২ তোলা।

অন্ন। বুদ্ধি শুক্রকর, ইন্দ্রিয়বলকারক।

অপরাজিতা। হিম, তিক্ত। পিত্তোদ্রব ও বিষদোষ নাশক, চক্ষুরোগে হিতকারী, ত্রিদোষ সমতা কারক, শোথ কাস নাশক, কণ্ঠের হিতকারী। মাত্রা মূল ২ মাষ।

অপামার্গ। আপাঙ। তিক্ত, কফ নিবারক, অর্শ, কৃমি, উদরাময় ও বিষ নাশক; ধারক, কান্তিকারক। মাত্রা ৪ মাষা। ফলগুণ, স্বাদু, বায়ুকারী।

অহিফেন্, আফিং। সন্নিপাত নাশক, শুক্রবল ও মোহকারক। মাত্রা—॥০ রতি।

অভ্রক। আব্বর। রসায়ন, স্নিগ্ধ, বলবর্ণ-অগ্নিকারক, কুষ্ঠ, মেহ ত্রিদোষ নাশক। মাত্রা ৪ রতি।

অমৃত ফল, নাসপাতি। বৃষ্য।

মাষ, মাষ কলাই।

অমৃতশ্রবা, রুদন্তি বৃক্ষ, লতাবিশেষ। রসায়ণ, ব্রণ নাশক, বিষ, কুষ্ঠ, আম, কামলা, শোথ নাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

অষ্ঠকী, আকনদি, নিমুখা। অতিসার নাশক, ত্রিদোষ নাশক, তিক্ত, গুরু, উষ্ণ। বাতপিত্ত, জ্বর, পিত্ত, দাহ ও শূল নাশক ভগ্ন সন্ধানকারী মাত্রা ২ তোলা।

অম্বু শিরীষিকা জল শিরীষ বৃক্ষ। ত্রিদোষ, বিষ, কুষ্ঠ, অর্শ নাশক।

অম্ল রুহা। রুচিকারক, দাহ নাশক, গুল্ম নাশক, আধ্মাননাশক। উচ্চারণশক্তি-কারক, অম্ল লোনিকা, আমরুল। কফবায়ু নাশক, অগ্নিকারক, গ্রহণী রোগে হিতকারী।

কুষ্ঠ ও অতিসার নাশক। মাত্রা ২ তোলা হইতে ৩ মাষা।

অম্লবেতস—বায়ু, কফ, অর্শ, শ্রম, গুল্ম নাশক, অরুচি নাশক, প্লীহা নাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

অরণ্য কার্পাসী। ব্রণ শস্ত্রক্ষত নাশক।

অরণ্য চটক। শুক্রকারক।

অরি, খদির ভেদ। রক্তপিত্ত নাশক।

অরিমেদ। শোথ ও অতিসার নাশক, কাস, বিষ, বিসর্প, নাশক। মাত্রা ১ তোলা।

অর্ক, আকন্দ। কটু, উষ্ণ অগ্নিকারক, বাত, শোথ, ব্রণ, অর্শ, কৃমিনাশক। কফ দোষ নাশক। মাত্রা মূল ৪ রতি হইতে ৬ রতি।

অর্ক—ক্ষীর। ক্রিমিদোষ ব্রণ নাশক। কুষ্ঠ, অর্শ, উদর রোগ নাশক, প্লীহা, গুল্ম, কাসনাশক। যকৃৎ নাশক। মাত্রা ২ রতি।

অর্জক, বাবুই তুলসী। কটু, উষ্ণ। কফ, বাত, নেত্র রোগ নাশক, রুচি কারক, সুখ প্রসব কারক।

অর্জ্জুন বৃক্ষ। কষায়, উষ্ণ। ব্রণ শোধন কারক, কফ, পিত্ত, শ্রম, তৃষ্ণা, মেদ, মেহ-নাশক। মাত্রা ২ তোলা।

অলক্ত, লাক্ষা, আলতা। কফ, পিত্ত, হিক্কা, কাস, জ্বর, কুষ্ঠ, বিসর্প, কৃমি, ব্রণ ও ক্ষতনাশক।

অলাবু। তুম্বি লাউ। হৃদ্য, পিত্ত, শ্লেষ্মা নাশক, বৃষ্য, রুচি কর, ধাতু পোষক, ভেদক ও পিত্ত নাশক।

অশোক। শীতল, হৃদ্য, পিত্ত, দাহ, শ্রম নাশক, গ্রাহী, গুল্ম নাশক, উদরাময় নাশক, কৃমি নাশক, তৃষ্ণা নাশক, মাত্রা ২ তোলা।

অনন্তক, অনকুচাই। পিত্ত, প্রমেহ, তৃষ্ণা, বিদাহ, বিষম জ্বর নাশক। ছর্দ্দি নাশক ভূত নাশক, মাত্রা ৩ মাষা।

অশ্বকর্ণ, শালবৃক্ষ বিশেষ। লতা শাল—কটু, তিক্ত, স্নিগ্ধ। কণ্ডু নাশক। বিস্ফোটক নাশক মাত্রা ২ মাষা।

অশ্বগন্ধা। কটু, উষ্ণ, বলশুক্রকারী, বায়ু কাস, শ্বাস, জরাব্যাধি নাশক, শ্বিত্র নাশক, মাত্রা ২ তোলা।

অশ্বত্থ। মধুর, কষায়, শীতল, কফ, পিত্ত নাশক, পক্ক ফল, যোনিদোষনাশক,দাহ ছর্দ্দি, শোথ, অরুচি নাশক, অম্ল পিত্তনাশক। মাত্রা ছাল ২ তোলা, বীজ ৯ রতি, ফল ১০ মাষা।

আসল পিয়াশাল। কটু, উষ্ণ, তিক্ত। কফ, পিত্ত নাশক, গলদোষ ও রক্ত মণ্ডল নাশক। মাত্রা ২ তোলা।

অস্থি সংহার, হাড়জোড়া। বালাস্থি ভগ্ন হিতকরী, বায়ু নাশক, বাতশ্লেষ্মা, ও অস্থি রোগ নাশক, কৃমি নাশক, অর্শ নাশক, বৃষ্য, মাত্রা শুষ্ক চূর্ণ ১৮ রতি।

আকাশ মাংসী, সূক্ষ্ম জটামাংসী। হিম, শোথ, ব্রণ, নাড়ী রোগ নাশক। লুতা, আলাহারক, বর্ণকারী। মাত্রা ১ মাষা।

আকাশবল্লী, লতাবিশেষ, মধুর, কটু। পিত্ত নাশক শুক্রবর্দ্ধক, রসায়ন, বলকারী। মাত্রা ৩ মাষা।

অখুকর্ণী, লতা বিশেষ। কটু, উষ্ণ। কফ পিত্ত নাশক, সারক, আনাহ, জ্বর শূল নাশক, পরম পাচক, কৃমি নাশক। মাত্রা ১ মাষা।

আখোট, আকরোট। বলকারী, মধুর, স্নিগ্ধ। বাত পিত্তনাশক, রক্ত দোষ নাশক।

(ক্রমশঃ)

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

আয়ুর্ব্বেদ ব্যবহার বিজ্ঞান—ডাঃ শ্রীদেবপ্রসাদ সান্যাল এল, এম, এস প্রণীত। ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতায় প্রাপ্তব্য। মূল্য ৩৷৷০ টাকা। মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করিতে হইলে মেডিকেল জুরিস্ প্রডেন্স অবশ্যই শিক্ষা করিতে হয়। আয়ুর্ব্বেদে এতদিন সেরূপ শিক্ষার অভাব ছিল।—এই গ্রন্থখানির প্রকাশে সে অভাব পূর্ণ হইল। সহজ কথায়, সরল ভাষায়, অতি সুন্দরভাবে বাঙ্গালায় এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ডাক্তার দেব বাবু চিকিৎসক মাত্রেরই উপকার করিয়াছেন। অপঘাতাদি আকস্মিক বিপদে কিরূপ কর্ত্তব্য অবলম্বন আবশ্যক, এগ্রন্থে তাহা জানিতে পারা যাইবে। আমরা এরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

মূত্রতত্ত্ব।—কবিরাজ শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায়, এইচ, এম, বি, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ প্রণীত। ৮৫ নং বিডন ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা। মূত্রপরীক্ষা ও মূত্র রোগের চিকিৎসাবিধি এলোপাথিক, হোমিওপ্যাথিক ও আয়ুর্ব্বেদীয় তিন প্রকার মত অবলম্বনে যেরূপ ভাবে লিখিত হইয়াছে, তাহাতে চিকিৎসক মাত্রেরই বিশেষ উপকার হইবে। গ্রন্থকার এ পুস্তক প্রণয়ণে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন, তাঁহার পরিশ্রম সার্থকই হইয়াছে। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট। আমরা সত্য সত্য এগ্রন্থখানি পড়িয়া আনন্দিত হইয়াছি।

রতিযন্ত্রাদির পীড়া।—ডাঃ শ্রীজ্ঞানেন্দ্র কুমার মৈত্র প্রণীত। মূল্য ৪৲ টাকা। ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে দেশের বালক ও যুবক বৃন্দ কিরূপ ভাবে স্বাস্থ্য নষ্ট করিতেছে তাহার বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া তাহার ফলে শুক্র সম্বন্ধীয় নানা প্রকার পীড়ার কথা ও হোমিওপ্যাথি মতে তাহার চিকিৎসা বিধি এ পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে। এধরণের গ্রন্থ যত প্রচারিত হয়, ততই মঙ্গল।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

আয়ুর্ব্বেদ সভা।—এই সভার কর্ত্তৃপক্ষগণ আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য যে ভাবে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা বড়ই প্রশংসনীয়। আগে ইহার সভাগৃহেই মাসিক সাধারণ সভার অধিবেশন হইত, এখন তাহার পরিবর্ত্তে কলেজ স্কোয়ারের সাধারণ স্থানগুলিতে সভা আহ্বানের ব্যবস্থা করায় আয়ুর্ব্বেদের কথা সাধারণকে জানান হইতেছে। ইহাতে লুপ্তপ্রায় আয়ুর্ব্বেদের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষিত হইবে। প্রতিমাসে 'তদ্বিজ্ঞ

সভা যা'র ব্যবস্থায় এই সভা যেভাবে ব্যাধি-তত্ত্বের আলোচনা করিতেছেন, তদ্বারা যথেষ্ট উপকার হইতেছে। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক মাত্রেরই এই সভায় যোগদানকরা কর্ত্তব্য।

কালাজ্বর।—কালাজ্বরের তত্ত্ব নির্ণয় ও তাহার চিকিৎসাবিধি স্থির করিবার জন্য এখন যেমন পাশ্চাত্য চিকিৎসকেরা বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিতেছেন, কলিকাতার আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকেরাও সেইভাবে চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। কলিকাতার আয়ুর্ব্বেদ সভাই এ কার্য্যে অগ্রণী হইয়াছেন। কলিকাতা করপোরেসনের সাহায্যে এজন্য কয়েকটি আয়ুর্ব্বেদীয় ওয়ার্ড খুলাইবারও চেষ্টা চলিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে যে সকল সুযোগ্য কমিশনারের হস্তে করপোরেসনের কার্য্যাবলী পরিচালিত হইতেছে, তাহাতে আশা করা যায়, তাঁহাদের এ প্রয়াস সফলই হইবে। আয়ুর্ব্বেদের মতে কালাজ্বর—বিষমজ্বরেরই শ্রেণী বিভাগ মাত্র, বিষম ও জীর্ণ জ্বরের চিকিৎসা আয়ুর্ব্বেদে যেরূপ আছে, সেরূপ আর কোন চিকিৎসায় নাই। কলিকাতা করপোরেসন যদি আয়ুর্ব্বেদ সভার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় কালাজ্বরের ওয়ার্ড খুলিবার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে তদ্বারা দেশের বিশেষ উপকার হইবে।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়।—কলিকাতা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়টির এ বর্ষের নূতন সেসন যথা কালেই আরম্ভ হইয়াছে। অন্যান্য বর্ষে ছাত্র সংখ্যাও যেরূপ হয় এবারও সেইরূপ হইয়াছে। ইহার সংশ্লিষ্ট দাতব্য চিকিৎসালয়টির কার্য্যও অতি সুন্দর ভাবে চলিতেছে। এবার এসময় কলিকাতার স্বাস্থ্য ভাল থাকিলেও এখানে কিন্তু রোগীর সংখ্যা কম হয় নাই, মেডিকেল ও সার্জ্জিকেল—উভয় বিভাগে এই চিকিৎসালয়ের রোগী সংখ্যা প্রত্যহ ৮০ হইতে ১০০ শত হইতেছে। এই চিকিৎসালয় হইতে কলিকাতার উত্তর পল্লী অঞ্চলের যে বিশেষ উপকার হইতেছে তাহা সুনিশ্চিত।

আয়ুর্ব্বেদ কমিটি।—গবর্ণমেণ্ট নিয়োজিত আয়ুর্ব্বেদ কমিটি আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি কল্পে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া বাস্তবিকই আমরা আশান্বিত হইয়াছি। প্রায়ই ইঁহারা পরামর্শ সভা আহ্বান করিয়া এ সম্বন্ধে ইতি কর্ত্তব্য নির্ণয়ের ব্যবস্থা করিতেছেন। ইহার ফলে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা—গবর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইলে আমরা বিশেষ সুখী হইব। রাজকীয় সাহায্যের অভাবেইতো এতদিন আয়ুর্ব্বেদ মাথা তুলিতে পারে নাই, এখন যদি সে সাহায্যের অভাব না হয়, তাহা হইলে ইহার পুনরুন্নতি হইতে যে বেশী সময় লাগিবেনা তাহা নিশ্চয়ই। সংপ্রতি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি কল্পে যেরূপ চেষ্টাশীল হইয়াছেন, তাহাতে সেই চেষ্টার সহিত গবর্ণমেণ্টের সাহায্য মিলিত হইলে, যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদের পুনরুদ্ধারে বদ্ধ পরি- হইয়াছেন তাঁহাদের মহান উদ্দেশ্য অতি সহজেই সিদ্ধ হইতে পারিবে।

কলিকাতা ১৯নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট মিলের লেন বিষ্ণু প্রেস হইতে কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১৭।১৯নং শ্যামবাজার ব্রিজ রোড অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় হইতে মুদ্রাকর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

আয়ুর্ব্বেদ

৮ম বর্ষ | ভাদ্র ও আশ্বিন, ১৩৩১। | ১২শ সংখ্যা।

আয়ুর্ব্বেদের প্রভাব।

(কবিরাজ শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত কাব্যতীর্থ-কবিভূষণ)

সম্ভ্রান্তসভাপতি ও সম্মাননীয় সভ্যমহোদয়-গণ। আয়ুর্ব্বেদ সভার কতিপয় সভ্য-মহোদয়ের অনতিক্রমণীয় আদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া আজ আমি এই অকিঞ্চন সন্দর্ভের অবতরণা করিতে বাধ্য হইয়াছি। কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয়ক প্রবন্ধ বর্ণনার ভার অর্পিত না থাকায় নিজবুদ্ধি-বিচারক্রমে যে বিষয়টী নির্ব্বাচন করিয়া গ্রহণ করিয়াছি, তৎসম্বন্ধে প্রথমেই অনানুষঙ্গিক দুই একটী কথা ব্যক্ত করা আবশ্যক মনে করি। বর্ত্তমান সভায় আমার বর্ণনীয় বিষয় "আয়ুর্ব্বেদের প্রভাব।" বিষয় নির্ণয়ান্তে রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াই অন্তঃ-করণে একটা সংশয়জনিত অন্তরায় উপস্থিত হইল, ঈদৃশ প্রবন্ধের প্রয়োজন কি? অত্রত্য সভাসদ্ মহোদয়-বৃন্দ মধ্যে সকলেই বৈদ্যক-শাস্ত্রী, আমার বক্তব্য কোন কথাই তাঁহাদের অগোচর নাই, সুতরাং ইহা তাঁহাদের পক্ষে পুরাতন, অতএব নিষ্প্রয়োজন। অপর পক্ষে যাঁহারা পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানবিদ্ তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই বৈদ্যকপ্রতিপক্ষ। তাঁহারা যে ইহাতে মনঃসংযোগ অথবা বক্তব্যের যৌক্তিকতা অবধারণ করিবেন এমত ভরসা করিনা। সুতরাং সর্ব্বতোভাবে বৈফল্য বুঝিয়াও মাত্র একটী কারণে এই ব্যর্থ প্রয়াসে

* আয়ুর্ব্বেদ সভার অধিবেশনে পঠিত।

উদ্ধৃত হইয়াছি। এ প্রবন্ধে অসাধারণ মনীষাশালী প্রতিষ্ঠাপন্ন প্রতিপক্ষগণ উপেক্ষা বা অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলেও কোন ক্ষতি মনে করি না, কিন্তু এদেশে সাধারণ জনের সংখ্যাই অধিক, তাঁহারা যদি কালস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে ইহাদ্বারা একটুও অবলম্বন প্রাপ্ত হয়েন,তাহাই আমার সাফল্যের প্রধান নিদর্শন হইবে।

বৈদ্যকানুশীলনকারী অথবা আর্য্য ধর্ম্মাবলম্বিগণ অবশ্যই অবগত আছেন যে "আয়ুর্ব্বেদ" অথর্ব্ববেদেরই অঙ্গবিশেষ, অতএব অপৌরুষেয়, আমাদের অদূরদর্শি-বুদ্ধিতে অপৌরুষের বস্তুর ধারণা হয় না। সত্য,তথাপি আয়ুর্ব্বেদ যে সাধারণ পুরুষ প্রণীত নহে তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। কোন্ যুগে কোন্ সর্ব্বশক্তিশালী মহাপুরুষ ইহার প্রণয়ন করেন তাহার নির্দ্ধারণ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া মাদৃশব্যক্তির পক্ষে পণ্ডশ্রমমাত্র। আয়ুর্ব্বেদের প্রারম্ভ পরিচয় বিষয়ে "ব্রহ্মাস্মৃত্বায়ুষোবেদং প্রজাপতিমজিগ্রহৎ" এই আর্ষবাক্যই দেখিতে পাই। ব্রহ্মা আয়ুর্ব্বেদকে স্মৃতিবলে প্রাপ্ত হইয়া প্রজাপতিকে শিক্ষাদান করেন, অনুভূত বস্তুরই স্মরণ সম্ভাবনা, সুতরাং তৎপূর্ব্বেও যে আয়ুর্ব্বেদের অস্তিত্ব ছিল ইহা এই উক্তিতেই প্রমাণিত হইতেছে। পক্ষান্তরে 'স্মৃ' ধাতুর যদি জ্ঞানার্থ গ্রহণ করা যায়, তবে স্মৃতা অর্থে অবগত হইয়া এরূপ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। সর্ব্বজ্ঞতা বশতঃ তিনি আপনা হইতেই আয়ুর্ব্বেদ আবিষ্কৃত করিয়া প্রজাপতিকে উপদেশ দান করেন। এরূপ ব্যাখ্যা অসঙ্গত নহে, ইহাতেও আয়ুর্ব্বেদের অপৌরুষেয়ত্ব খণ্ডিত হয় না, যেহেতু ব্রহ্মা পুরুষাতীত। এতৎসম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণার আবশ্যকতা নাই, কারণ আমরা লৌকিক আয়ুর্ব্বেদেরই অনুবর্ত্তনে প্রবৃত্ত। সংসারে যখন আমরা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের প্রথম প্রচারণার ইতিবৃত্ত দেখিতে পাই, তাহার পরও বহুসহস্রবৎসর অতীত হইয়াছে। উক্ত সময়কেই যদি আয়ুর্ব্বেদের প্রারম্ভকাল নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা হইলে তৎসমকালে অথবা তৎপরবর্ত্তী ২।১ সহস্রবর্ষ মধ্যে যে অন্য কোন চিকিৎসাশাস্ত্র উদ্ভূত ছিলনা ইহা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণই স্বীকার করেন। জগতে বৈদ্যকশাস্ত্রের প্রথম প্রচারকালীন ইতিবৃত্তের আলোচনায়ও এবিষয়ের অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত দেখিতে পাই। যেকালে ইউরোপ প্রভৃতি পাশ্চাত্য জাতির অস্তিত্বের নিদর্শনও পাওয়া যায় নাই,সেই অতি প্রাচীনকালীন ইতিহাসের পর্য্যালোচনায় অবগত হওয়া যায়, যে, তখন ও এই আর্য্যভূমি ভারতবর্ষে উন্নত জ্ঞান বিজ্ঞানাধিকারী, তপস্যাপরায়ণ, মহিমশালী মানব মণ্ডলী ঐহিক ও পারত্রিক ধর্ম্মকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া পরমসুখে শান্তি এবং সুদৃঢ় স্বাস্থ্যের সহিত কাল যাপন করিতেন। মানসিক শক্তিপ্রভাবে ও প্রকৃতির অবস্থায় সম্যক্ অনুশীলনে তাঁহারা এতই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন যে, ধাতুবৈষম্যজনিত ব্যাধি প্রায়শঃই তাঁহাদের সম্মুখীন হইতে অবকাশ প্রাপ্ত হইত না। তৎকালে সনাতন আর্য্য ধর্ম্মানুসরণে উচ্চ বর্ণের অধিকাংশ লোকই অল্পাধিক যোগাভ্যাস ও তপশ্চরণে প্রবৃত্ত থাকিতেন; ঐ যোগ ও তপোবলে আর্য্যগণ প্রদীপ্তহুতাশনের ন্যায় বর্ত্তমান ছিলেন, রজস্তমোময় পাপ স্বভাব ব্যাধি তাহাদের

অঙ্গস্পর্শ করিতে পারিত না। সাময়িক ব্যতিক্রম বশতঃ যদ্যপি কদাচিৎ কোন রোগ উপস্থিত হইত কিন্তু তখনই তাঁহারা প্রাকৃতিক শক্তিপ্রভাবে তাহাকে শত্রু বোধে দূরীভূত করিতে পারিতেন। অতএব তৎকালে রোগ প্রতীকার জন্য কোন অনুশাসনের আবশ্যক হইত না। সুতরাং তখন প্রয়োজনাভাব বশতই আয়ুর্ব্বেদের প্রচার ছিল না। ইহাই অনুমান সিদ্ধ।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিটী বিষয়ই মানব জীবনের প্রধান লক্ষ্য। কোন দেশে, কোন ব্যক্তিরই এতদ্ব্যতীত কাম্যবস্তু থাকিতে পারে না। স্বাস্থ্যসম্পন্ন দীর্ঘজীবন লাভই উক্ত চতুর্ব্বর্গলাভের প্রধান উপায়; সেই জন্যই পূর্ব্বকালে দেহরক্ষার জন্য নানাবিধ যোগ প্রাণায়ামাদি কতকগুলি সদনুষ্ঠান নিত্যক্রিয়ারূপে সমাজে প্রচলিত ছিল। উহাদ্বারা যেমন মানসিক একাগ্রতা সাধিত হইত, ধাত্বাদির পুষ্টি, ও স্থৈর্য্যকারিতা গুণে শরীরও তদনুরূপ সবল ও কর্ম্মক্ষম হইত। দুরতিক্রমণীয় কাল প্রভাবে, মানবগণ যখন অলসতা, অধৈর্য্য এবং ভোগবিলাসাদি দোষের বশবর্ত্তী হইয়া প্রাকৃতিক ও মানসিক শক্তি হইতে ক্রমে ক্রমে বিচ্যুত হইতে লাগিল, এবং নিজের স্বভাব বলে, ঐ স্খলনের পথ হইতে মুক্তিলাভে সমর্থ হইতে পারিল না, তখনই দেহরক্ষার নিমিত্ত অস্বাভাবিক উপায়ের অবলম্বনে বাধ্য হইল। তখন সর্ব্ব-বিভূতিশালী মহাযোগী সিদ্ধমহর্ষিগণের বিশ্ব-প্রেমপ্রবণ, পরহিতময় প্রাণ এই আকস্মিক অকল্যাণকর, কলুষ স্বরূপ ব্যাধির বিশ্বধ্বংস-কর পরাক্রমে একান্তই কাতর হইয়া উঠিল, তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, শান্তি নিকেতন, পবিত্র সংসার ক্ষেত্রে রোগ-রাক্ষসের ক্রূরদৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে, এ অবস্থায় নিশ্চিন্ত থাকা অসম্ভব, অচিরাৎ ইহার প্রতিকার আবশ্যক, নতুবা মানবের সুখ শান্তি রক্ষার কোনও উপায়ান্তর নাই। লোকহিতব্রত মহর্ষি গণের এই দূরদর্শি-চিন্তাই সংসারে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের প্রসূতি। অলৌকিক প্রতিভা ও অসাধারণ প্রভাব সম্পন্ন দিব্যশক্তিশালী মহর্ষি মণ্ডলী স্বয়ং আধিব্যাধি মুক্ত; কিন্তু জগতের হিতানুষ্ঠানই তাঁহাদের জীবনব্রত সুতরাং সংসার রক্ষার্থ তাৎকালিক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য তাঁহারা প্রাকৃতিক শান্তিময়, নির্ব্বাধ, দেবভূমি হিমাচলের এক নিভৃত পার্শ্বদেশে সমবেত হইয়া কোন উপায়ে রোগরাক্ষসের করাল কবল হইতে সংসার রক্ষিত হইবে, এতদ্বিষয়ক তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য পরস্পরের অভিমত জিজ্ঞাসা করিলেন। এই সমিতিতে তৎকালীন বিশ্ববিশ্রুত, জ্ঞান বিজ্ঞানের আকর, স্বাধ্যায় তপঃসম্পন্ন, মহর্ষি মণ্ডলীর সমস্ত সম্প্রদায়ই প্রায় সমাগত হইয়াছিলেন। সভার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থাপিত হইলেই মহর্ষিগণ স্ব স্ব অভিমত জ্ঞাপনের নিমিত্ত ধ্যানাবলম্বী হইলেন। কি মোহন দৃশ্য! কোনও বাক্ বিতণ্ডা নাই, পরস্পরের জিগীষা প্রণোদিত পাণ্ডিত্যাভিমান জনিত প্রাসঙ্গিক, অপ্রাসঙ্গিক বক্তৃতার আড়ম্বর নাই, সকলেই ধ্যানস্তিমিত লোচন, স্থাণুবৎ স্থির ও ধীরভাবে নিজ নিজ নির্ম্মল অন্তঃ-করণ-দর্পণে কর্ত্তব্যপথের প্রতিবিম্ব দর্শন করিতে লাগিলেন। আজন্ম সৎশিক্ষা,

সত্যপথানুসরণ ও জ্ঞান বিজ্ঞানানুশীলনাদি মঙ্গলময় ব্রতে নিরত থাকায়, তাঁহাদের রজস্তমোময়, রাগদ্বেষাত্মক কোন বিকারই অধিকার পাইত না। অতএব তাঁহারা নিজ নিজ অন্তঃকরণ-প্রবৃত্তিকেই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের প্রমাণ রূপে গ্রহণ করিতেন। কোন বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইলে, অন্তঃকরণের প্রবৃত্তি অনুসারেই তাহার নিরাকরণ করিতেন। তাঁহাদের মলমুক্ত মানস-মুকুরে যাহা প্রতিফলিত হইত, তাহা অভ্রান্ত ও সিদ্ধান্তরূপেই পরিগণিত হইত। মিথ্যা, ছলনা, ঈর্ষা, দ্বেষহিংসাদি তাঁহাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত ছিল না অথবা অশিক্ষাজনিত কোনরূপ কুসংস্কার ও তাঁহাদের প্রতিভা-প্রদীপ্ত হৃদয়ে স্থান পাইত না। কর্ত্তব্যবোধে জগতের হিতার্থে তাঁহারা যাহা বলিতেন তাহাই শাস্ত্র। যে পথে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন তাহাই বিশ্ববাসীর অবলম্বনীয় সৎপথ ছিল। তাঁহারা যখন সমাধিযোগে জ্ঞাননেত্রে কর্ত্তব্যপথ অবলোকন করিলেন, তখনই অপূর্ব্ব প্রীতিরসে পরিপূর্ণ হইয়া সকলেই সমকালে একই অভিমত প্রকাশ করিলেন। ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গ সাধনের মূলীভূত কারণ, স্বাস্থ্যারত্নের অপহর্ত্তা মানব জীবনের প্রধান বিঘ্ন স্বরূপ এবং সর্ব্ববিধ মঙ্গলের ধ্বংসকারী রোগাসুরকে বিনাশ করিবার জন্য আয়ুর্ব্বেদই একমাত্র উপায়। উক্ত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের উপদেশ লাভ করিতে হইলে অমরপতি ইন্দ্রদেবই আশ্রয়ণীয়। সুরনাথ সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার অনুকম্পা হইলে ইহলোকে আয়ুর্ব্বেদের প্রচার হইবে, তাহাতে সংসার স্বাস্থ্যসম্পন্ন হইয়া সুখ শান্তি সহকারে ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারিবে। এইরূপ পরামর্শ স্থিরীকৃত হইলে মহাত্মা মহর্ষি ভরদ্বাজ অগ্রণী হইয়া ইন্দ্রদেব-সমীপে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষালাভের জন্য নিজের সমুৎসুকতা জ্ঞাপন করিলেন। অপরাপর ঋষিগণও সর্ব্ববিদ্যাসম্পন্ন ভরদ্বাজকে যোগ্যতম বিবেচনা করিয়া তৎপ্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন। মহামুনি ভরদ্বাজ দেবেন্দ্র সমীপে উপস্থিত হইলে দেবরাজ তাঁহার সদুদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্যসাধনযোগ্য বিপুল বুদ্ধিশক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া পরম প্রীতির সহিত তাঁহাকে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। শিষ্যের জ্ঞান ও প্রতিভার গৌরবানুসারেই শিক্ষণীয় বিষয়ের ফলাফল নির্ভর করে। স্থূলবুদ্ধি বা অল্পমতি শিষ্যকে সাধারণ বিষয় বুঝাইতে ও আচার্য্যের যথেষ্ট চেষ্টা লইতে হয়, কিন্তু অপূর্ব্ব প্রতিভাসম্পন্ন মহর্ষি ভরদ্বাজকে, দেবরাজ যে ভাবে আয়ুর্ব্বেদের উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা বর্ত্তমানকালে মহা মনীষীগণেরও বিস্ময়জনক। সুরপতি কতিপয় পদ নিবদ্ধ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের তিনটী মূল সূত্র মাত্র মহর্ষিকে উপদেশ দেন। সুস্থ ব্যক্তির স্বাস্থ্য রক্ষা হেতু, স্বাস্থ্যের লক্ষণ ও স্বাস্থ্য রক্ষার উপায় এবং পীড়িতের পীড়া হেতু, ব্যাধির রূপ ও চিকিৎসা, ইহাই ঐ তিনটী মূল সূত্রের তাৎপর্য্য। সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রই গূঢ়ভাবে উক্ত মূল সূত্র তিনটীর অন্তর্নিহিত। মহামুনি ভরদ্বাজ স্বকীয় অলৌকিক প্রতিভা বলে, ঐ মূল সূত্র তিনটীর অনুসরণ করিয়া সুবিস্তৃত ও পূর্ণাঙ্গ

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র প্রণয়ন পূর্ব্বক অন্যান্য ঋষিদিগকে শিক্ষা দেন, এই তিনটী মূল সূত্রে নিবদ্ধ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকে সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য বিশাল পূর্ণাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের প্রনয়ন করা কিরূপ গভীর গবেষণা ও বিপুল জ্ঞানের ফল, তাহা আমাদের ন্যায় ব্যক্তির ধারণার অতীত। মহামহিমমণ্ডিত মহর্ষিগণ কিরূপ অলৌকিক প্রতিভা লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এই সমস্ত প্রমাণেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। আয়ুর্ব্বেদীয় বিষয়ই আমাদের প্রতিপাদ্য, এখানে তৎসম্বন্ধেই ঋষিদের দিঙ্মাত্র প্রতিভার কথা বর্ণিত হইল; বস্তুতঃ জগতের আদিম, অভ্রান্ত, প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণ-সিদ্ধ জ্ঞান বিজ্ঞানাত্মক, ধর্ম্ম, জ্যোতিষ, দর্শন প্রভৃতি যাবতীয় শাস্ত্রই চিরপূজ্য, সেই মহাত্মাগণের সমাধিসিদ্ধ, সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার ফল। এই প্রবন্ধে আয়ুর্ব্বেদের প্রভাব সন্দর্শনই উদ্দেশ্য, তন্নিমিত্ত প্রবন্ধ মুখেই আয়ুর্ব্বেদের প্রয়োজন, প্রচার-পদ্ধতি ও প্রচারকের স্বাধিকারে যোগ্যতার খ্যাপন, আবশ্যক মনে করিয়া এই ভূমিকার অবতারণা করিলাম। আশা করি ইহা অপ্রাসঙ্গিক বিবেচিত হইবে না।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, সুস্থ ব্যক্তির স্বাস্থ্য রক্ষণই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের প্রথম উদ্দিষ্ট বিষয়, যথা নির্দ্দিষ্ট স্বাস্থ্য চর্য্যাপরায়ণ মানবের ধাতুসাম্য রক্ষিত থাকে এইজন্য সহসা কোন শারীর ব্যাধি জন্মিতে পারে না। রোগ প্রতিকারার্থ চিকিৎসা বিধানের আবশ্যকতা সত্য, কিন্তু যে উপায়ে ব্যাধি উৎপন্ন হইতে না পারে তাহা তদপেক্ষা অধিকতর বাঞ্ছনীয়। এ বিষয়ে মতভেদ হইতে পারে না। বৈদ্যক শাস্ত্রের সর্ব্বত্রই প্রায় প্রাকৃতিক অবস্থার তত্ত্বানুশীলন ও তদুপযোগী আচরণ দ্বারা দেহ ও মনকে সবল রাখার বিধান দেখা যায়। সাধারণতঃ তাদৃশ আচরণই স্বাস্থ্য রক্ষার মূল। আয়ুর্ব্বেদোক্ত দিনচর্য্যা, ঋতুচর্য্যা, প্রকৃতি, সাত্ম্য, শীতোষ্ণাদি দেশগত বৈষম্য প্রভৃতি বিষয়ে কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যসুখ সহসা ব্যাহত হয় না। তাঁহারা নীরোগ ও দীর্ঘজীবী হইয়া দুর্লভ জীবনের সম্পাদ্য কর্ম্মানুষ্ঠানের আশানুরূপ অবসর প্রাপ্ত হন। এস্থলে প্রমাণ স্বরূপ শার্ঙ্গধরের কতিপয় সুভাষিত উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"বর্ষশতং খল্বায়ুষঃ প্রমাণকাস্মিনকালে, সন্তি পুনরধিকবর্ষ শতজীবিনোমনুষ্যাঃ, তেষাং বিকৃতিবর্জ্জ্যৈঃ প্রকৃত্যাদিবলবিশেষৈঃ আয়ুষো-লক্ষণতশ্চ প্রমাণমুপলভ্য বয়স ন্ত্রিত্বং বিভজেত"।

এই উক্তিতে আমরা বিকারবর্জ্জিত প্রকৃত্যাদির বল বিশেষের দ্বারা বর্ত্তমানকালে নির্দ্দিষ্ট শতবর্ষাধিক পরমায়ু লাভ করা যায় এবং তাদৃশ দীর্ঘজীবী লোক সংসারে বহুসংখ্যক আছেন ইহা জানিতে পারি। এখানেও এবম্বিধ দীর্ঘজীবন লাভের স্বাস্থ্যচর্য্যাই হেতু বুঝা যাইতেছে, প্রকৃতির অনুকূল বিধির অনুশীলনেই বিকৃতিকে বর্জ্জন করা যায় এবং উহাই স্বাস্থ্যচর্য্যার মূল সূত্র। এই প্রসঙ্গেই উক্ত গ্রন্থে পুনরুক্ত হইয়াছে—

তত্র শারীরমানসাভ্যাং রোগাভ্যামনভি

দ্রুতস্য জ্ঞান বিজ্ঞানেন্দ্রিয়েন্দ্রিয়ার্থ বলসমুদায়ে বর্ত্তমানস্য রুচিরবিবিধোপভোগস্য সমৃদ্ধ সর্ব্বারম্ভস্য যথেষ্ট বিচরণাং সুখমায়ুরুচ্যতে। অসুখমতো বিপর্য্যয়েণ। হিতৈষিণঃ পুনর্ভূতানাং পরস্বাদুপরতস্য সত্যবাদিনঃ শমপরস্য পরীক্ষ্যকারিণঃ অপ্রমত্তস্য ত্রিবর্গং পরস্পরেণানুপহতং উপসেবমানস্য পূজার্হ সম্পূজকস্য জ্ঞান বিজ্ঞানোপশমপরস্য বৃদ্ধোপসেবিনঃ সুনিয়তরাগের্ষামদমানবেগস্য সততং বিবিধপ্রদান পরস্য তপোজ্ঞান প্রশম নিত্যস্য অধ্যাত্মবিদ স্তৎপরস্য লোকমিমঞ্চামুঞ্চা বেক্ষমাণস্য স্মৃতিমতো হিতমায়ুরুচ্যতে। অহিত মতো বিপর্য্যয়েণ, অর্থেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধি চেষ্টাদীনাং বিকৃতিলক্ষণৈরুপলভ্যতে।" সাধারণ জনের বোধগম্যার্থ উক্ত বাক্যসমূহের মর্ম্মানুবাদ দেওয়া হইল। যাহারা শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি মুক্ত, জ্ঞান বিজ্ঞান এবং সর্ব্বেন্দ্রিয় শক্তিসম্পন্ন, বিবিধ রুচিকর ভোগ সম্ভোগকারী, সমুন্নত কর্ম্মশীল, তাঁহারা শান্তি সহকারে জীবন অতিবাহিত করেন। ইহার বিপরীত অনুষ্ঠানে রত হইলেই জীবিতকাল ক্লেশের হেতু হয়। সর্ব্বপ্রাণীর মঙ্গলে নিরত, পরবিত্তে লোভহীন, সত্যভাষী, সম গুণাবলম্বী, সদ্ অসদ্ বিচার পূর্ব্বক কর্ত্তব্যকারী, অবহিত চিত্ত, পরস্পরের অপ্রতিবন্ধকভাবে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সেবাপরায়ণ, পূজ্যজনের পূজাকারী, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও শান্তির আশ্রয়ী, বৃদ্ধজনসেবী, রাগ, ঈর্ষা, মত্ততা ও গর্ব্বহীন, দান তৎপর, নিত্য তপোজনিত শান্তি পরায়ণ, অধ্যাত্মতত্ত্ববিদ্, অধ্যাত্মবোধানুসারি কর্ম্মরত, ঐহিক ও পারত্রিক বিধির প্রতি অভিনিবিষ্ট এবং হিত বিষয়ে স্মরণশীল, ঈদৃশ মহাত্মাগণ হিতায়ুসম্পন্ন হইয়া সুখ শান্তির সহিত দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করেন। এই প্রসঙ্গে মহর্ষি চরক ও বলিয়াছেন—

"বর্ষশতং খল্বায়ুষঃ প্রমাণং অস্মিন্কালে, তস্যানিমিত্তং প্রকৃতিগুণাত্মসম্পৎসত্যোপসেবন ঞ্চেতি।"

বর্ত্তমান কালে জীবিত কালের পরিমাণ শতবর্ষ। প্রাকৃতিকগুণ, আত্মনিষ্ঠা ও সত্য ব্যবহারই দীর্ঘায়ুরক্ষার হেতু। এই সব উক্তিতেও আমরা দেহধারণের ও নির্ব্বাধ জীবন যাত্রার জন্য স্বাস্থ্যচর্য্যারই প্রাধান্য দেখিতে পাই। অধ্যাত্ম বিষয়ক কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান, বিশেষ জ্ঞান ও কষ্টকর অভ্যাস-সাপেক্ষ, কিন্তু অন্যান্য যে সকল শারীর বিজ্ঞানের কথা এই সব প্রস্তাবে উক্ত আছে, তাহা পালনকরা কাহারও পক্ষে দুঃসাধ্য নহে। কোন ঋতুতে কোন দোষের প্রবলতা হয়, ঐ দোষের উপশমের জন্য তৎকালে কিরূপ আহার বিহারাদি কর্ত্তব্য, কোন্ প্রকৃতি ব্যক্তির পক্ষে কোন কোন দ্রব্য পথ্য বা অপথ্য, কোন দ্রব্যসহযোগে কোন দ্রব্যের ভোজন বিরুদ্ধ অথবা কোন বস্তু লঘুপাকী হয়, দিবারাতের মধ্যে কোন সময়ে কোন দোষের প্রকোপ হয়, মধুরাদিষট্ রসের পৃথক পৃথক গুণ কর্ম্ম প্রকৃতিভেদে উহাদের বিধি নিষেধ, কোন রস কোন দোষের বর্দ্ধক বা প্রশমক ইত্যাদি নিত্য স্মরণীয় ও অত্যাবশ্যকীয় বিষয় গুলি বৈদ্যকশাস্ত্রের প্রায় প্রতিগ্রন্থেই সবিস্তার বর্ণিত আছে। স্বাস্থ্যকামী মনোযোগ পূর্ব্বক তত্তৎ বিষয়ের আলোচনা ও অনুবর্ত্তন করিলে ব্যাধির আক্রমণ হইতে উদ্ধার পাইতে পারেন। ভগবান্ আত্রেয় মহর্ষি অগ্নিবেশের

কোন উপায়ে রোগোৎপত্তির নিবৃত্তি হয়" এই প্রশ্নোত্তরে বলিয়া ছিলেন—শরীর ও মনই রোগের আশ্রয়স্থল, রোগোৎপত্তির পূর্ব্বেই যদি নিত্য নিয়মিত প্রতিক্রিয়াদ্বারা দেহ ও মনকে বিশুদ্ধ রাখা যায় তাহা হইলে রোগোৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে না। যে ব্যক্তি শীতকালের সঞ্চিতদোষ বসন্তে, গ্রীষ্মসঞ্চিত দোষ বর্ষায় এবং বর্ষাসঞ্চিত দোষ শরৎকালে নির্হরণ করে, ঋতু জনিত ব্যাধি তাহাকে অভিভব করিতে পারে না। যে ব্যক্তি হিতকর আহার বিহার সেবী, শারীর বিবেকসম্পন্ন, অনাসক্তিসহ বিষয় ভোগী, সত্যবান্, ক্ষান্তিশীল, আপ্তসেবী, গুরু, বৃদ্ধ, সিদ্ধ, মহর্ষি প্রভৃতি পূজ্যজনের অর্চ্চনা তৎপর, সে ব্যক্তি নীরোগ দেহে দীর্ঘজীবন যাপন করে। যাহার জ্ঞান, তপস্যা, যোগতৎপরতা, পবিত্র বুদ্ধি, মন ও কর্ম্ম বর্ত্তমান থাকে, সে ব্যক্তি কদাপি রোগাক্রান্ত হয় না। প্রাতঃ কালীন শয্যাত্যাগ হইতে নৈশশয্যা গ্রহণ কাল পর্য্যন্ত যে সময়ে যে ভাবে যে সমস্ত দেহমনের সর্ব্বথা হিতকারী, আধিব্যাধির যাতনা নাশক অবশ্য কর্ত্তব্য নিত্য নৈমিত্তিক স্বাস্থ্যচর্য্যাবিধি বৈদ্যক শাস্ত্রে নিবদ্ধ আছে, ঐ সকল সহজসাধ্য নিয়মের পালন পক্ষে সংসারে কোনই প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত হয় না। অথচ উহার অনুসরণে আমাদের মানবজীবনের শ্রেষ্ঠকাম্য স্বাস্থ্যসম্পদ রক্ষিত হয়। দুই একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা আমি এবিষয়ের উপযোগিতা দেখাইতেছি। ন্যূনাধিক পঞ্চাশৎবৎসর পূর্ব্বেও শিশুগণের জন্মগ্রহণের পর হইতে ৮।১০ বৎসর পর্য্যন্ত প্রত্যহ যথারীতি নেত্রাঞ্জন ব্যবহার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, তাহাতে পরিণত বয়সেও উক্ত বালকগণের দৃষ্টিশক্তি অব্যাহত থাকিত। আমি নিজেই একজন এই বিধির দৃষ্টান্তস্থল। শৈশবে চোখে কাজল দিবার কথা অদ্যাপি বিস্মৃত হই নাই। কারণ ৭।৮ বৎসর বয়ঃক্রম কালেও অঞ্জন দিবার উৎপাত হইতে পরিত্রাণলাভের জন্য বালোচিত যে সব উপায় অবলম্বন করিতাম ও পরিশেষে মাতৃদেবীর কঠোর শাসনে নিরুপায় হইয়া অঞ্জন লইতে বাধ্য হইতাম, তাহা সহজে ভুলিবার বিষয় নয়। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আজ এই প্রায় ষাট বৎসর বয়সেও যে দৃষ্টিশক্তি অপ্রতিহত আছে ইহা সেই সদনুষ্ঠানেরই ফল। এপর্য্যন্ত কোন দিন আমি নেত্ররোগে আক্রান্ত বা দৃষ্টিশক্তিহীনতার জন্য চশমা লইতে বাধ্য হইনাই। এইরূপ দৃষ্টান্তদ্বারা সমর্থনকরা এক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে এবং সন্তবপর ও নয়, কর্ত্তব্য বোধে নিত্যাবশ্যকীয় কতকগুলি স্বাস্থ্য বিধির উল্লেখ করিতেছি, যাহা প্রতিগৃহে প্রতিদিনই পালনীয়। যথা—অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করতঃ শৌচবিধি সমাপন করিবে, তাহার পর আকন্দ, বট, খদির, করঞ্জা অর্জ্জুন, করবীরাদি তিক্ত ও কটু ও কষায় রসযুক্ত বৃক্ষের কোমল অগ্রভাগ দ্বারা দন্ত মার্জ্জনা করিবে। ইহাতে দন্ত মলহীন সুসম্বদ্ধ ও দন্তমূল সুদৃঢ় হয়। এই হিতকারী অথচ অনায়াসসাধ্য বিধান ত্যাগ করিয়া আমরা আজকাল যৌবনাগমনের পূর্ব্বেই দশনহীন বা দন্ত বেষ্টগত রোগাক্রান্ত হইয়া জীবন যাপনের প্রধান অবলম্বন আহার সুখে বঞ্চিত এবং অজীর্ণাদি রোগাক্রান্ত হইয়া অতি কষ্টে দুর্ভর জীবনভার বহন করিতেছি। এইরূপ তৈলাভ্যঙ্গ, স্নান, ব্যায়াম, উদ্বর্ত্তন,

পাচকাগ্নি রক্ষণ, ভ্রমণবিধি প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয়েরই নির্দ্দিষ্ট বিধান আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ আছে এখন ঐ সকল বিধান প্রায়ই যথাযথ ভাবে পালিত হয় না, তাহার ফলে দেশের স্বাস্থ্য দিন দিন অধঃপতিত হইতেছে। এক শতাব্দি পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় লোকের যেরূপ বল, বীর্য্য, দীর্ঘজীবন ও স্বাস্থ্য সম্পদ দেখা যাইত আজ কাল সেরূপ প্রায়ই দৃষ্টি গোচর হয় না, ইহার প্রধান কারণ, আমরা আমাদের প্রকৃতি সিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদের প্রভাবকে হঠকারিতা দোষে অতিক্রমণ করিতেছি। স্নান, আহার, বিহার, বেশ, ভূষা, শয়ন, আসন এমনকি হাস্য, ভাষাদি পর্য্যন্ত এ দেশে শাস্ত্রের নিষিদ্ধ বিধির অনুসরণেই বিহিত হইতেছে। বিরুদ্ধ ভোজন, অকালে ভোজন নিষিদ্ধ ভোজন, অতৈল ও অসময়ে স্নান, প্রকৃতি বিরুদ্ধ বেশভূষা, অসমভাবে শয়নাসন, উগ্রবীর্য্য ধূমপান, অসাত্মকর মাদক সেবন, অস্থানে হাস্যভাষ্যাদি, শরীরের পক্ষে কত অনিষ্টকর, তাহা কেহই চিন্তা করেন না, অথবা তদ্বিষয়ক কোন সংস্কার না থাকায় চিন্তার অধিকারী ও হইতে পারেন না। পূর্ব্বকালে আহার বিহারাদি দ্বারা শরীর স্বাস্থ্য সম্পন্ন, দীর্ঘকালস্থায়ী, বলিষ্ঠ ও শ্রম সহিষ্ণু হইত এখন আহার বিহারাদি দোষে শরীর চিররুগ্ন, ক্ষণভঙ্গুর, অধৈর্য্যশীল ও দুর্ব্বল হইতেছে, ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। আয়ুর্ব্বেদ-বিধির অবমাননাই ইহার প্রধান হেতু। কার্য্য কারনালোচনায় একথা স্পষ্টতই প্রতীত হয়। আজকাল সামান্য কারনেই ঘরে ঘরে যে এত রোগের প্রাদুর্ভাব ইহাই তাহার কারণ। ধাতুক্ষীনতা, অগ্নিমান্দ্য, প্রমেহ, বহুমূত্র, ক্ষয়, বিষমজ্বর প্রভৃতি কতকগুলি দুরারোগ্য ব্যাধি আমাদের দেশকে যেরূপ ভাবে আশ্রয় করিয়াছে তাহা চিন্তা করিলে, কোন্ হৃদয়বান, দেশপ্রেমিক নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। উক্ত ব্যাধি সকল অবশ্য নূতন নহে, কিন্তু প্রাচীন কালে ঘরে ঘরে, জনে জনে, এরূপ পরিদৃষ্ট হইত না। স্বাস্থ্যরক্ষা বিধির অবহেলা ও প্রকৃতি বিরুদ্ধ, পাশ্চাত্য রীতির অনুসরণ ইহার প্রধান হেতু, এই জন্যই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে রোগ প্রতীকারাপেক্ষা স্বাস্থ্যচর্য্যাই অধিক আবশ্যকীয় বলিয়া প্রথমোদ্দিষ্ট হইয়াছে। ভ্রম বা প্রমাদ বশতঃ প্রাকৃতিক রীতির অতিক্রমই রোগোৎপত্তির কারণ। যদি আমরা সাবধানে প্রকৃতির নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া চলিতে পারি, তাহা হইলে সহসা কোন দুঃসাধ্য ব্যাধি উপস্থিত হইতে পারেনা। সংসার ক্ষেত্রে নানা জাতীয় কর্ত্তব্যে নিবদ্ধ মানবের পক্ষে যথাশাস্ত্র স্বাস্থ্য বিধির অনুসরণ অবশ্য সহজ সাধ্য বা সম্ভবপর নয়, এবং কোন কালেই কেহ তাহা রক্ষা করিতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ, তথাপি একথা বলা যাইতে পারে, যে অধুনা আমরা ক্ষমতা সত্ত্বেও অজ্ঞতা বা অশ্রদ্ধাবশে যেরূপ ভাবে, সেইসব হিতকারী, সনাতন রীতির লঙ্ঘণ করিতেছি, প্রাচীনকালে কখনই সেরূপ হইত না। তখন সামাজিক রীতিবশে বা ধর্ম্মহানি ভয়ে লোক আহার, বিহার, স্নানাদি বিষয়ে শাস্ত্রানুসারে প্রবৃত্ত থাকিত। আয়ুর্ব্বেদের প্রভাবকে আমরা ইচ্ছা করিয়াই ত্যাগ করিতেছি কিন্তু আমরা ভুলিয়া যাই যে, উহা আমাদের অস্থি মজ্জাগত, বংশানুক্রমিক পরম সম্পদ, প্রকৃতি শক্তির সর্ব্বথা অনুকূল,

ইচ্ছা বা অনিচ্ছাক্রমে ত্যাগ করিবার বিষয় নহে। যে জল মাটিতে আমরা গঠিত, যে সমাজ, যে ধর্ম্মানুশাসন, যে আহার-বিহার-পরিচ্ছদাদিতে আমরা অভ্যস্ত, তদবলম্বনেই বৈদ্যক-শাস্ত্র প্রণীত, কাজেই স্বাস্থ্যরক্ষার বা রোগ-প্রতীকারে উহা আমাদের সর্ব্বাংশে উপযোগী। মোহমুগ্ধ হইয়া আমরা যে পরিমাণে ইহার প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করিতেছি, ঠিক সেই হিসাবেই স্বাস্থ্যহীনতা ও রোগ-যন্ত্রণা আমাদিগকে জর্জ্জরিত এবং অকর্ম্মণ্য করিতেছে। জানিনা, কতকালে আমাদের এ মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইবে। নিজের গৃহপ্রাঙ্গনস্থিত অযত্নসুলভ, অমূল্য রত্নকে অবহেলায় বর্জন করিয়া, আমরা বহুসহস্র-ক্রোশস্থিত, পাশ্চাত্য দেশসম্ভূত দুর্লভ কাচ-খণ্ডের প্রতি আসক্ত হইয়া নিজেকে ও স্বদেশকে দারিদ্র্য এবং অস্বাস্থ্যের পথে চালিত করিতেছি। পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান, গভীর গবেষণা মূলক বা বিশেষ সমৃদ্ধ হইতে পারে, আমি তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত নহি বা তদ্বিষয়ে আমার কোন অধিকার নাই, কিন্তু কোন উৎকৃষ্ট বস্তু যে জগতের সকলের পক্ষে সমান প্রয়োজনীয় বা আদরণীয়, ইহা যুক্তিযুক্ত মনে করিনা। বৈজ্ঞিকশাস্ত্রবিধি, ভারতের পক্ষে যত অনুকূল, অপর দেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্র সেরূপ হইতে পারে না। জড়জগতের প্রাকৃতিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলেও আমরা এ বিষয়ের যৌক্তিকতা বুঝিতে পারি। যে দেশে, যে জল-মাটীর গুণে, যে সকল তরুলতা গুল্মাদি বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়া, বিবিধ ফলপুষ্পাদি পরিশোভিত হয়, ভিন্ন দেশীয়—ভিন্ন প্রাকৃতিক জলমাটির সহযোগে কদাপি সেরূপ হয় না। কারণ, ভিন্ন দেশজ ভিন্ন প্রাকৃতিক জল-মৃত্তিকাদি ঐ জাতীয় তরুলতা-গুল্মাদির প্রকৃতির সমধর্ম্মী নহে। পৃথক্ পৃথক্ দেশজাত, জলমৃত্তিকাদির প্রকৃতির সহিত তত্তদ দেশীয় জীবজন্তু তরুলতাদির প্রকৃতি যেমন সম্বন্ধযুক্ত, তেমনই তত্তদ দেশজাত আহার্য্যবস্তু বা ভেষজ দ্রব্যের সহিত ও সমধর্ম্মিতা-গুণে সম্পর্কিত। এই নিমিত্তই আয়ুর্ব্বেদে উক্ত হইয়াছে—

"যস্ত দেশস্ত যো জন্তু স্তজ্জং তস্যৌষধংহিতং"

যে প্রাণী যে দেশে জন্মগ্রহণ করে, তাহার পক্ষে সেই দেশ জাত ঔষধই হিতকারী। ইহা নূতন নহে, বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এ সত্য মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানে এ সত্যকে আজ সেই আর্য্য মহর্ষিগণের বংশসম্ভূত ভারতীয় লোক অবহেলায় অবমানিত করিতেছেন। ইহা অপেক্ষা দেশবাসীর পক্ষে পরিতাপের বিষয় কি হইতে পারে? দেশের এই দুর্দ্দশার কারণ একমাত্র পাশ্চাত্য শিক্ষা। প্রকৃত শিক্ষায়, মানুষকে ও সমাজকে উন্নত করে, সমাজের অভাব বা কুসংস্কারকে দূরীভূত করিয়া সুখ সমৃদ্ধিপূর্ণ করে, কিন্তু বর্ত্তমান পাশ্চাত্য-শিক্ষাপদ্ধতি আমাদের পক্ষে ইহার বিপরীত ফলই প্রসব করিতেছে। এই শিক্ষা-প্রভাবে, আমরা জাতীয়জীবনহীন স্বধর্ম্মচ্যুত পরনির্ভরশীল; অধিক কি যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার ন্যায় পরের ইচ্ছানুসারে পরের কার্য্যেই চালিত হইতেছি। যাদুকরী বিদ্যার মত এই মোহিনী শিক্ষার মোহে আমরা এতই আত্ম বিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছি যে, আমাদের জাতীয় জীবন কোন্ উপাদানে গঠিত, কোন

ধর্ম্ম, কোন কর্ম্ম, কিরূপ আহারবিহারাদি, আমাদের প্রকৃতির অনুকূল, অথবা ইহাদের কোন গুলি কি কারণে আমাদের প্রকৃতি বিরুদ্ধ, এসব বিষয়েরও অনুসন্ধান আবশ্যক বোধ করি না। শীতপ্রধানদেশজাত, রাজবিধির অনুশাসনে, আমরা আমাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ ব্যাপারে সর্ব্বদাই ব্যাপৃত আছি, বুদ্ধির ভ্রমে বা অনুকরণপ্রিয়তা-দোষে, অসাত্ম্যকর বুঝিয়াও ঐ সব ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করি না। পাশ্চাত্য বিদ্যালয়ে শিক্ষার বিষয় আলোচনা করিলে ইহার একটা দৃষ্টান্ত বুঝা যাইবে। জাতীয় ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আচার, ব্যবহার, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি যাহা কিছু আমাদের গৌরবের বিষয়, তৎসমস্তই নব্য শিক্ষাস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, এস্থলে তাহা আমার আলোচ্য বিষয় নহে, কিন্তু ঐ শিক্ষাস্রোতে যে দেশের আশা ভরসাস্থল, যুবক ও বালকগণের স্বাস্থ্য সম্পদ দুরীভূত হইতেছে, তাহা উপেক্ষা করা কষ্টকর। স্কুল কলেজের ছাত্রগণের মধ্যে সুস্থ, সবল, হৃষ্ট, পুষ্ট, বলিষ্ঠ, প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। যথাকালে বিদ্যালয়ে সমাগত হইবার জন্য বেলা ১ প্রহর অতীত হইতে না হইতে বালকদের স্নান, আহার, সম্পন্ন করিতে হইবে। তৎকালে ক্ষুধার উদ্রেক হৌক্ বা না হৌক্ তাহার চিন্তা করিবার অবসর নাই। বেলা ১০ দণ্ড পর্য্যন্ত কফ প্রকোপের সময়, তখন পাচকাগ্নি মন্দ থাকে, তৎকালে ভোজন করিলে ভুক্ত দ্রব্য ভালরূপ পরিপাক প্রাপ্ত হয় না, অতএব অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণাদি নানা রোগ জন্মে। ভোজনান্তে কিঞ্চিৎকাল পদচারণা করিয়া বিশ্রাম লাভ করা স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে বিশেষ আবশ্যকীয়, এ নিয়ম পালনও ছাত্রগণের পক্ষে অসম্ভবপর। তাহারা অতি দ্রুত ভাবে কোন মতে আহার কার্য্য সমাপন পূর্ব্বক, আপাদবদ্ধ পরিচ্ছদে সম্পূর্ণরূপে আবৃতদেহ হইয়া বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়। গ্রীষ্মকালীন প্রখরসূর্য্যকরেসন্তপ্ত সর্ব্বাঙ্গ হইতে স্বেদ ধারা নির্গত হইতেছে, গাত্রদাহে অস্থির হইতেছে, অথচ দৈনিক নির্দ্দিষ্ট পাঠাভ্যাসে বাধ্য। অতিরিক্ত ঘর্ম্মস্রাবে দিন দিন শরীর দুর্ব্বল ও অবসাদগ্রস্ত হইতেছে, তথাপি বিদ্যা শিক্ষার বিরাম নাই। মাসান্তে, বর্ষান্তে পরীক্ষা দিতে হইবে, দেহের দশা যাহাই হৌক্, শিক্ষিত হওয়া চাই; এ কিরূপ শিক্ষা? "ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুত্তমং।' যে দেশের ইহাই বীজমন্ত্র, বিদ্যা বা জ্ঞানার্জ্জন দূরের কথা, যে দেশের আর্য্য সন্তান ধর্ম্মপ্রাণ হইয়াও স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতিবন্ধক ধর্ম্মার্জ্জনকেও বর্জ্জন করিতে উপদেশ দেন, সেই ভারতে আজ কিরূপ শিক্ষাপদ্ধতি চলিতেছে তাহা চিন্তা করিলে সবারই বিষম মনঃক্ষোভ উপস্থিত হইবে। কেবল বালক ও যুবকগণ নহে, অফিসের কর্ম্মচারীবর্গও এই নিয়মে আবদ্ধ। আমাদের দেশ গ্রীষ্মপ্রধান, এরূপ দৈশিক সাত্ম্যবিপরীত, শীতপ্রধান দেশোচিত, রীতির নিত্যানুষ্ঠানে কিরূপ কুফল জন্মিতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বিদ্যা বা অর্থার্জ্জনের প্রধান উদ্দেশ্য, শারীরিক ও মানসিক শান্তি লাভ; কিন্তু উক্ত রীতিতে বিদ্যার্থী বা কর্ম্মচারীগণের পক্ষে সেই দুইটীই দুর্লভ। আমাদের বংশানুক্রমিক এবং নৈসর্গিক শাস্ত্রোক্ত সাত্ম্যবিধির লঙ্ঘনদোষে কেবল আমরাই

অধঃপতিত হইতেছি এমন নহে, কিন্তু ভাবী-বংশধরগণেরও ধ্বংসের বীজ বপন করিয়া যাইতেছি।

বর্ত্তমান শিক্ষা বা কর্ম্মজীবনেও আমরা আমাদের জীবনের সারসম্বল আয়ুর্ব্বেদের প্রভাবকে বিনষ্ট করিতেছি। জীবনযাত্রা, ধনার্জ্জন ও ধর্ম্মসঞ্চয়, আয়ুর্ব্বেদের এই তিনটী ক্রমনির্দ্দিষ্ট স্তর পরস্পর সাপেক্ষভাবে নিবদ্ধ। জীবন নির্ব্বাধ ও শান্তিপূর্ণ না হইলে ধনার্জ্জন সম্ভবপর হয় না, ধনার্জ্জন ব্যতীত জীবনের কোন প্রয়োজনই সুসাধিত হইতে পারে না, সংসার-ধামে আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু মাত্রই অর্থায়ত্ত, অতএব যাহাতে ধনাগমের প্রশস্ত পথ অবলম্বন করা যায়, তৎপ্রতি বৈদ্যক শাস্ত্রে নানাবিধ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। তারপর ধর্ম্ম কি? ধর্ম্মের লক্ষণ, সাধন-প্রণালী, পরিণাম প্রভৃতির বিষয়, যুক্তি ও প্রমাণ সহকারে উপদিষ্ট হইয়াছে, সুতরাং আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র, কেবল আমাদের শারীর ব্যাধি প্রতিকারক গ্রন্থ নহে। ইহা একাধারে চিকিৎসা, অর্থনীতি ও ধর্ম্মশাস্ত্ররূপে আমাদের যাবতীয় কল্যাণের আকর স্বরূপ। অথচ ইহার প্রত্যেক অধ্যায়, প্রত্যেক বাক্যই আমাদের দৈহিক সুখশান্তি ও মানসিক সমুন্নতির অনুসরণেই নির্দ্দিষ্ট। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইচ্ছাক্রমে বা অনিচ্ছায় আমরা আয়ুর্ব্বেদের প্রভাব লঙ্ঘন করিতে পারি না। ঘরে, বাহিরে, শয়নে, স্বপনে, আহারে, বিহারে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে আয়ুর্ব্বেদ আমাদের স্বভাবসিদ্ধ সুহৃদের ন্যায় কল্যাণকামনার অনুসরণ করিতেছে। দুষ্পরিহার্য্য কালের ক্ষণিক আবর্ত্তনে আমরা সাময়িক মোহগ্রস্ত হইয়াছি, এ মোহভ্রান্তি চিরস্থায়িনী হইবে না। আয়ুর্ব্বেদাধিদেবের প্রাসাদালোকে আবার আমরা নিজ কর্ত্তব্য-মার্গ অবলোকনে জাতীয় জীবন, স্বাস্থ্যসম্পদ্ এবং ধর্ম্ম কর্ম্ম জনিত গৌরবে মণ্ডিত হইব। একথা আমি উদ্‌ভ্রান্ত কল্পনা বলে বা সাময়িক উত্তেজনা বশে বলিতেছি না; আশা-সাফল্যের অস্ফুট পূর্ব্বরূপ দর্শনেই এরূপ বলিতে সাহসী হইতেছি। সেই নিত্য, সত্য, অভ্রান্ত, বিশ্বজনীন শুভঙ্কর, স্বকীয়প্রভাব-প্রভায়—ভাস্বর, পঞ্চম বেদ, আয়ুর্ব্বেদ ভাস্কর সাময়িক মোহ মেঘাবরণে আবৃত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে আমাদের হতাশ বা নিরুদ্যম হওয়া উচিত নয়। ভারতাকাশে জাতীয় জীবনের উদ্বোধন রূপ অনুকূল অনিল ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে, অনতিবিলম্বে সেই মোহ-মেঘাবৃতি, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। কত যুগ যুগান্তর ব্যাপী, রাষ্ট্রবিপ্লব, ধর্ম্মবিপ্লব, সামাজিকবিপ্লবের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াও সহস্র সহস্র বৎসর যে আয়ুর্ব্বেদ নিজের অপ্রতিহত প্রভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া বিশ্ব বাসীর অশেষ কল্যাণ সম্পাদন করিতেছে,, তাহা অবিনশ্বর, অক্ষয়। যতকাল সৃষ্টির সত্তা থাকিবে, ততকাল, আয়ুর্ব্বেদের প্রভাব জগতে প্রদীপ্ত থাকিবে।

সভ্য মহোদয়গণ, পরিশেষে আমার এই নিবেদন যে, এই প্রবন্ধে আমাদের প্রকৃতির উপর আয়ুর্ব্বেদের প্রভাব মাত্রই পরিদর্শিত হইয়াছে। শারীরিক অসুস্থতা ও দেশান্তরে অবস্থান নিমিত্ত প্রতিপাদ্য বিষয়ের বর্ণনা সমাপ্ত করিতে পারি নাই।

ব্যাধি এবং তৎ প্রতীকার বিষয়ে আয়ুর্ব্বেদের প্রভাব বারান্তরে প্রকাশ করিতে সঙ্কল্প আছে, যদি ভগবৎ কৃপায় সুবিধা ও সুযোগ উপস্থিত হয় তবে সঙ্কল্প—কার্য্যে পরিণত হইবে।

ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর।

(কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন)

ম্যালেরিয়া ও কালা জ্বর—দুইটি ভীষণ ব্যাধিই বাঙ্গালায় বিস্তৃতি লাভ করিয়া বসিয়াছে। ম্যালেরিয়ার তো কথাই নাই – ইংরাজ রাজত্বের সৃষ্টির কিছু কাল পরে ১৮০৪ খৃঃ অব্দে—মুর্শিদাবাদ ও কাশিম-বাজারে সর্ব্ব প্রথমে এই ম্যালেরিয়ার মূর্ত্তি বাঙ্গালা দেশের অধিবাসীগণ যে জানিতে পারিল, তাহার প্রকট ভাব উপস্থিত হইল উহার বিশ বৎসর পরে ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজা সীতারাম প্রতিষ্ঠিত মহম্মদপুরে। ঐ বৎসরই ঐ ম্যালেরিয়া রোগে ঐ গ্রামের ৪।৫ হাজার লোক কাল কবলিত হইল। তাহার পর যশোহরের চিত্রানদীর দুই ধার দিয়া বহু গ্রাম—বহু জনপদ ধ্বংস করিয়া নদীয়ায় ইহার প্রকট মূর্ত্তি পূর্ণভাবে দেখা দিল। নদীয়া হইতে ক্রমশঃ সমগ্র বাঙ্গালায় ম্যালেরিয়া-রাক্ষসী করাল বদনব্যাদানে দেশ-বাসীকে গ্রাস করিয়া বসিল। এ সব কথার আলোচনা আমরা আয়ুর্ব্বেদে বহু বার করিয়াছি। ফলে ম্যালেরিয়া এখন বাঙ্গালার সর্ব্ব প্রধান ভীষণ ব্যাধি। শ্রাবণের শেষ হইতে শীতের প্রারম্ভ কাল পর্য্যন্ত ইহার জ্বালা সহ্য করিবার জন্য বঙ্গবাসী এখন যেন প্রস্তুত হইয়াই বসিয়া থাকে, বর্ষার অন্তে এই ভীষণ রোগের আক্রমণ নীরবে সহ্য করিতেই হইবে—ইহা এখন বঙ্গবাসী মাত্রেরই ধারণা।

কালা জ্বরের মূর্ত্তি কিন্তু বাঙ্গালীর নিকট এখনও নূতন। এই সর্ব্বনেশে রোগ বাঙ্গালায় বেশী দিন আগমন করে নাই। আগে যাহারা আসাম অঞ্চলে যাইত, তাহারাই কালাজ্বরে ভুগিত বলিয়া বাঙ্গালী জানিত। পেটের জ্বালায় অতি কষ্টে না পড়িলে এই জন্য আগে কেহ আসাম অঞ্চলে যাইতও না। এক কথায় এই কালাজ্বরটা আমদানী হইয়াছে আসাম হইতেই। আসামে ইহার নাম ছিল কালা—আজর। উহা হইতে বাঙ্গালায় এখন উহা 'কালাজ্বর' নাম ধারণ করিয়াছে।

এখন আর কালাজ্বর বলিলে আসামের জ্বর বুঝায় না, কয়েক বৎসর হইতে ইহাও যেন এখন বাঙ্গালার নিজস্ব রোগের মত হইয়া পড়িয়াছে।

আমরা কিন্তু ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর—দুইটি জ্বরকেই বিষমজ্বরের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই গণ্য করিয়া থাকি। পাশ্চাত্য

চিকিৎসাবিদগণ স্থির করিয়াছেন, ম্যালেরিয়া জ্বরে—(১) নির্দ্দিষ্ট সময়ে বা পালা করিয়া জ্বর কমে বাড়ে বা জ্বর-বিচ্ছেদ ঘটে। কুইনাইনে জ্বর বন্ধ হয়। (২) শরীরের ক্রমিক দুর্ব্বলতা ইহাতে ঘটে না, জ্বরের পালার মধ্যে রোগী বেশ কাজ করিতে পারে। (৩) প্লীহা বড় হয়, কিন্তু যকৃৎ বেশী বড় হয় না। (৪) ম্যালেরিয়া জ্বরে দ্বৌকালীন জ্বর বিরল। (৫) অণুবীক্ষণের দ্বারা রক্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, রক্ত ও শ্বেত কণিকা—উভয়েরই তুল্য-রূপে ধ্বংস হইতেছে।

পাশ্চাত্য চিকিৎসকমণ্ডলী কালাজ্বরের উপসর্গ গুলির নির্ণয় নিম্নলিখিত রূপ করিয়াছেন (১) জ্বর অনেক দিন ধরিয়া চলিতে থাকে। কখনও জ্বর ছাড়ে, কিন্তু জ্বর ছাড়িবার বা বাড়িবার নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। কুইনাইনে জ্বর বন্ধ হয় না। (২) অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য এবং ক্রমিক শীর্ণতা বড় বেশী বেশী ঘটিয়া থাকে। প্লীহা যকৃৎ—দুইই বড় হয়। (৩) দ্বৌকালীন অবিরাম জ্বর কালাজ্বরেই বেশী। (৪) কালাজ্বরে শ্বেত-কণিকা ১/৪ হইতে ১/৮ পর্য্যন্ত কমিয়া যায়। শ্বেত কণিকা দেহ রক্ষার কার্য্য করে। এই জন্য উহারা কমিয়া গেলে নিউমোনিয়া-রক্তাতিসার, যক্ষ্মা প্রভৃতির রোগ-বীজাণু সমূহ দুর্ব্বল শরীরকে পাইয়া বসে।

পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ আরও স্থির করিয়াছেন, **ম্যালেরিয়া জ্বর—বহু কম্প ও বহু উপদ্রবের সহিত অগ্রসর হয় আর কালাজ্বর নিঃশব্দে অগ্রসর হইতে থাকে।** কালাজ্বরে ১০৩।১০৪ ডিগ্রি তাপ উঠিলেও বিশেষ উপদ্রব দেখা যায় না। ম্যালেরিয়া জ্বর সন্ধ্যা কিম্বা রাত্রিতে আসে। কালাজ্বর সকালে আসে ও দ্বৌকালীন অবিরাম জ্বরে প্রকাশ পায়। ম্যালেরিয়া জ্বরের জীবাণু সর্ব্বদা রক্তে দেখিতে পাওয়া যায়, আগে হইতে কিন্তু যাঁহারা কুইনাইন খাইয়া থাকেন, ম্যালেরিয়া জ্বরের জীবাণু তাঁহাদের পরীক্ষা কালে দুর্লভ হয়। কালাজ্বরের জীবাণু কিন্তু এরূপ ভাবে দেখা যায় না, প্লীহা ও যকৃৎ হইতে রক্ত লইয়া দেখিলে তবে উক্ত রোগের জীবাণু দেখা যায়।

ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর সম্বন্ধে পাশ্চাত্য চিকিৎসকদিগের কথা সংক্ষেপে বলিলাম, এইবার আয়ুর্ব্বেদের কথা বলিব। আয়ুর্ব্বেদে বিষমজ্বরের শ্রেণীবিভাগে বলা হইয়াছে, যে জ্বর সাত দিন, দশ দিন বা দ্বাদশ দিন নিয়ত ভোগ করে, তাহার নাম সন্তত, ইহা রস ধাতুকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই জ্বরে দেহের গুরুতা, বমন ভাব, অবসাদ, বমি, অরুচি ও ক্লান্ত চিত্তত্ব—এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

যে জ্বর দিবা রাত্রির মধ্যে দুইবার অর্থাৎ দিনে একবার ও রাত্রিতে একবার কিম্বা কেবল দিনেই দুইবার অথবা রাত্রিতে দুইবার হইয়া থাকে, তাহার নাম সততক। এই জ্বর রক্তকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয় এবং এই জ্বরে মুখ হইতে অল্প রক্তোদ্গীরণ, দাহ মোহ, বমন, বিভ্রম, প্রলাপ, পীড়কা, (ব্রণ বিশেষ) ও তৃষ্ণা—এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়।

যে জ্বর দিবা রাত্রির মধ্যে একবার মাত্র হইয়া থাকে, তাহার নাম অন্যেদ্যুষ্ক। ইহা

মাংসকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই জ্বর জানুর অধোজঙ্ঘা মাংস পিণ্ডে তর্থাৎ পায়ের ডিমে দণ্ডাদি দ্বারা পীড়ন বৎ বেদনা, তৃষ্ণা, মল মূত্রের অতি প্রবৃত্তি, বাহিরে তাপ, অন্তরে দাহ, হস্ত পদাদি সঞ্চালন ও গ্লানি—এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

যে জ্বর প্রতি তৃতীয় দিনে অর্থাৎ একদিন অন্তর হয়, তাহার নাম তৃতীয়ক। এই জ্বর মেদাগত। এই জ্বরে অতিশয় ঘর্ম্ম, পিপাসা, মূর্চ্ছা, প্রলাপ, বমন, শরীরে দুর্গন্ধ, অরুচি, গ্লানি ও অসহিষ্ণুতা—এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

যে জ্বর প্রতি চতুর্থ দিনে অর্থাৎ দুইদিন অন্তর হয়, তাহাকে চাতুর্থক জ্বর কহে। এই জ্বর অস্থি ও মজ্জাগত। এই জ্বরে অস্থি সমূহে ভঙ্গবৎ বেদনা, কুন্থন, শ্বাস, মল রেচন, বমন, হাত পা ছোড়া এবং অন্ধকার দর্শন, হিক্কা, কাস, শীত, বমি, অন্তর্দাহ, মহাশ্বাস ও হৃদয়চ্ছেদবৎ বেদনা—এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়।

ডাক্তারেরা সন্তত জ্বরের নাম করণ করিয়াছেন, Remiteent fever সতত জ্বরের নামকরণ করিয়াছেন Donble Quatidion অন্যেদ্যুষ্ক জ্বরের নাম করণ করিয়াছেন, quotidian তৃতীয়ক জ্বরের নামকরণ করিয়াছেন, Tertion এবং চাতুর্থক জ্বরের নামকরণ করিয়াছেন quontian.

আয়ুর্ব্বেদে বিষম জ্বরের শ্রেণী বিভাগে চাতুর্থক-বিপর্য্যয় নামে আর এক প্রকার জ্বরের পরিচয় আমরা পাইয়া থাকি। ইহা মধ্যে দুই দিবস হয়, আদি ও অন্তে থাকে না।

আয়ুর্ব্বেদে বিষম জ্বরের এরূপ শ্রেণী-বিভাগ থাকিলেও আয়ুর্ব্বেদের মূলতত্ত্ব বায়ু, পিত্ত, কফ লইয়াই এই বিষম জ্বর গুলি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ডাক্তারেরা ম্যালেরিয়া জ্বরে শরীরের নিম্নলিখিত রূপ অবনতির পরিচয় দিয়াছেন,—

ম্যালেরিয়া জ্বরে যকৃৎ ও প্লীহা বড় হয় এবং তাহাতে কাল রং আসিয়া জমে। রক্তহীনতা অর্থাৎ পাণ্ডুতা ম্যালেরিয়া জ্বরে দৃষ্টগোচর হয়। চর্ম্ম—রক্তাল্পতা বশতঃ ম্লান ও অমসৃণ হয়। খোস, পাচড়া, দদ্রু, স্ফোটক, কর্ণমূল, উরুস্তম্ভ ও পৃষ্ঠব্রণ—ম্যালেরিয়া জ্বরে অধিক দিন ভুগিলে প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। মস্তিষ্কের কপিশ বর্ণ—কপিশতর হয়। চক্ষু হরিতাভ ও জ্যোতিঃহীন হয়। হৃৎপিণ্ড ও ফুস্‌ফুস্ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। হৃৎপিণ্ডের থলিগুলি বড় শক্তিহীন হয়, রক্ত সঞ্চালন শক্তিও ক্রমে কমিয়া যায়। রোগীর হাত পা ফুলিতে থাকে, ক্রমে উদরী ও সর্ব্ব শরীরে শোথ হইতে দেখা যায়। যকৃৎ—রক্তে পূর্ণ হইয়া থাকে এবং যকৃতে প্রদাহ উপলব্ধি হয়। যকৃতের অংশ সমূহ স্থানে স্থানে রূপান্তর প্রাপ্ত ও কঠিনস্পর্শ হইয়া উঠে। ম্যালেরিয়া জ্বরে যকৃৎ বেশ বড় হইয়া উঠে কিন্তু কালাজ্বরে যকৃতের বিবৃদ্ধি ম্যালেরিয়া অপেক্ষা আরও বেশী।

ম্যালেরিয়া জ্বরে প্লীহাও বেশ বড় হয়। মূত্রগ্রন্থি ও অন্ত্রি সমূহে ম্যালেরিয়া এবং কালা জ্বরে স্থানে স্থানে প্রদাহ ও ক্ষত দেখা যায়। অস্থি ও মজ্জা 'মসীক' রঞ্জিত দেখায়। মস্তিষ্ক এবং

স্নায়ু মণ্ডলের বহুরোগ ম্যালেরিয়ার সহিত ঘটিয়া থাকে। ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ড ঘটিত পীড়াও ম্যালেরিয়া এবং কালাজ্বরে কম ঘটে না। বায়ুকোষ ও বায়ুনালীর প্রদাহ (Bronchitis) ম্যালেরিয়া রোগীর অবস্থা আরও শোচনীয় করিয়া তোলে। মূত্রগ্রন্থির প্রদাহও ম্যালেরিয়ায় ঘটিয়া থাকে। অনেক সময় অণ্ডকোষ ফুলিয়া জ্বর ও বাত শিরা যুক্ত জ্বর ও ম্যালেরিয়ার আক্রমণে দেখা যাইয়া থাকে। অতিসার, রক্তাতিসার, উদরাময়, অগ্নাতিসার, বিসর্প, বহু প্রকার চর্ম্মরোগও ম্যালেরিয়ার ফল সম্ভূত।

আয়ুর্ব্বেদের যে বায়ু, পিত্ত, কফের কথা বলিতেছিলাম, বিষমজ্বরের উৎপত্তির কারণই সেই বাতাদি দোষ সম্ভূত। বাতাদি দোষ যে যে ধাতুকে আশ্রয় করিয়া যে যে জ্বর উৎপন্ন করে, পূর্ব্ব কথিত সন্ততাদি জ্বর বলিয়া তাহারাই অভিহিত। জ্বর মুক্তির পর দেহের ক্ষীণতা থাকিতে অবৈধ আহার বিহার করিলে অনতিবল দোষও প্রবুদ্ধ এবং বায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া রস রক্তাদি কোনো ধাতুকে আশ্রয় করিয়া বিষম জ্বর উৎপাদন করে। ইহা ভিন্ন কখন কখন প্রথম হইতেও বিষম জ্বর হইতে দেখা যায়। যাহা হউক এখনকার কথা—ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর কি? ম্যালেরিয়া জ্বর যে বিষম জ্বর ভিন্ন স্বতন্ত্র ব্যাধি নহে, সে কথা অবিসংবাদিতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। কালাজ্বরেও ম্যালেরিয়ারই মত বিষম জ্বরের অন্তর্গত। কালা জ্বরের সংজ্ঞা নির্ণয়ে সততক জ্বরের অনেক চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যায়। দুইবার করিয়া জ্বর হওয়া কালা জ্বরের একটি প্রধান লক্ষণ—ইহা আয়ুর্ব্বেদে সততক জ্বর বলিয়া কথিত। আয়ুর্ব্বেদে যে বাতবলাসক জ্বর কথিত আছে, তাহার পরিচয়ে আমরা জানিতে পারি, ঐ জ্বরে রোগী শ্লেষ্মবহুল, জড়প্রায়, রুক্ষদেহ, শোথবিশিষ্ট ও অবসন্ন হয়। কালাজ্বরে বেশীদিন ভুগিলে ঐরূপ অবস্থাও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ম্যালেরিয়ার সহিত কালাজ্বরের আর একটা বিশেষ প্রভেদ যে, ম্যালেরিয়া জ্বরে অধিক দিন ভুগিলে রোগী পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করে অর্থাৎ ফ্যাকাসে হইয়া পড়ে। কালাজ্বরের রোগী কিন্তু সেরূপ হয় না, কালাজ্বরের রোগীর বর্ণ হয় ঘোর কালো। পল্লীগ্রামে 'কৃষ্ণকামল' বলিয়া কামলা রোগের যে নামান্তর প্রচলিত আছে, কালাজ্বরের রোগীর অবস্থা সেইরূপই হইয়া থাকে। ম্যালিরয়া জ্বরেও প্লীহা যকৃতের বিবৃদ্ধি হয়। কালাজ্বরে ঐ দুইটীর বিবৃদ্ধি কিন্তু ম্যালেরিয়া অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়া থাকে। ম্যালেরিয়া জ্বরে অনেক সময়েই মল কঠিন, দাস্ত ভালরূপে পরিষ্কার হয় না। কালাজ্বরে অনেক সময় তরল ভেদও ঘটিয়া থাকে। ম্যালেরিয়া জ্বরে রোগী জ্বরের সময় কাজ কর্ম্ম করিতে পারে না, দুর্ব্বলতা অনুভব করে এবং জ্বর না থাকিলে বেশ কাজকর্ম্ম করিতে পারে। কালাজ্বরে যে সময় জ্বর থাকে না, সে সময়ও রোগী দুর্ব্বলতা যথেষ্ট অনুভব করিয়া থাকে, জ্বরের সময় ত কথাই নাই, অন্য সময়ও কাজকর্ম্ম করিবার ক্ষমতা তাহার লুপ্ত হইয়া থাকে।

এইবার চিকিৎসার কথা বলিয়া অন্ত এই প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি করিব। ম্যালেরিয়া কি কালাজ্বর বিবেচনা না করিয়া পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্‌গণ যেরূপ ঐ দুইটি রোগের চিকিৎসা করিতে পারেন না, আমাদের কিন্তু তাহার কোন কারণ নাই। অ্যালোপ্যাথেরা ম্যালেরিয়া জ্বরে কুইনাইন প্রয়োগে যে শুভ ফল পাইয়া থাকেন, কালাজ্বরে সে ফল প্রাপ্ত হন না—এইজন্যই তাঁহাদের অত বিবেচনা। আমরা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ যখন কুইনাইনের প্রয়োগ করি না, তখন আমাদের সে চিন্তা করিবার কারণ কি? হরিতাল—ম্যালেরিয়াই বলুন আর কালাজ্বরই বলুন, সকল প্রকার বিষম জ্বরেই তো আমরা অনায়াসে ব্যবহার করিতে পারি। উহার প্রয়োগে বিবেচনার বিষয় কিছুই নাই। হরিতালঘটিত বৃহজ্জ্বরাঙ্কুশ যদি প্রাতঃকালে জ্বরের বেগ কম অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা ম্যালেরিয়াই হউক আর কালাজ্বরই হউক, শুভ ফল ফলিবেই। একবার ঐরূপ বৃহৎ জ্বরাঙ্কুশ, মধ্যাহ্নে, একটী আগ্নেয় ঔষধ, বৈকালে অভয়া লবণ, গুড় পিপ্‌পলী প্রভৃতি প্লীহা নাশক ঔষধ—যদি ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে প্লীহা যকৃৎ কমিয়া আসে, জ্বরও মুক্ত হইয়া থাকে।

ইহা ভিন্ন সনাতন আয়ুর্ব্বেদ বনজ ভেষজে পরিপূর্ণ। সেই সকল বনজ ভেষজের সমন্বয়ে বৃহৎ ভার্গাদি, দাস্যাদি প্রভৃতি পাচনের প্রয়োগ ম্যালেরিয়া হউক আর কালাজ্বরই হউক, আমাদের মতে যে অতি শুভ ফল পাওয়া যায়, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

মায়ের পূজা।

(কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন)

আবার মা আসিতেছেন। বাঙ্গালার বরা মালঞ্চে আবার স্থলপদ্মের দল ফুটিয়া মাতৃপূজার অর্ঘ্য হইবার জন্য উন্মুখদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে। রক্ত জবা রাগ ভরে জগন্মাতার চরণপদ্মে পড়িবার ধন্য হইবার জন্য আশায় আকুল হইয়া রহিয়াছে। কাননকুন্তলা বঙ্গ পল্লীর প্রান্তর পার্শ্বে অপরাজিতার অপূর্ব্ব সৌরভ পান্থকুলের মনঃমুগ্ধ করিতেছে। সেফালির শুভ্র কলিকাগুলি প্রস্ফুটিত হইয়া মর্ত্ত্যবাসীর নাসারন্ধ্রে স্বর্গের সুরভি উপস্থিত করিতেছে। কোন্ পুষ্পের কথা বলিব? যত্নসুলভ উদ্যানজাত বেলা, চামেলি, টগর, মল্লিকা—সকল পুষ্পই এখন আর কলিকা দশায় থাকিতে ইচ্ছুক নহে,—মায়ের আগমনে সকলেই এখন গর্ব্বগরিমায় প্রস্ফুট হইয়া পড়িয়াছে। অযত্নসুলভ ফুটন্ত বনমল্লিকার অদ্ভুতপূর্ব্ব মদগন্ধেও মানব মাত্রেরই মন আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছে।

নীল-স্বচ্ছ কাশপ্রদেশ অতি পরিষ্কার। প্রতি পক্ষে জ্যোৎস্নার আনন্দে সকলের মন আনন্দ-রসে আপ্লুত হয় সত্য, কিন্তু মায়ের আগমনের পূর্ব্ব জ্যোৎস্নারাশির এরূপ রজত শুভ্র নির্ম্মল শোভা অন্য সময় হয় কিনা বলিতে পারি না। দেবী পক্ষের এই ফুটন্ত জ্যোছনায় যে প্রাণ মাতান কি এক উন্মাদনা শক্তি নিহিত রহিয়াছে, তাহা বাঙ্গালী ভিন্ন অন্যে বুঝিবে না। নির্ম্মল গগনে তারকা নিকর বেষ্টিত চন্দ্রের শোভাও এই সময় যেরূপ মনোমদ হইয়া থাকে, সেরূপ বুঝি অন্য সময়ে হয় না। কত প্রবাসী বাঙ্গালী প্রকৃতির এই অপূর্ব্ব নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য দর্শনে প্রিয়জনের সহিত মিলন সম্ভাবনায় আশায় দিন কাটাইতেছে। সুকুমারমতি বালক-দিগের আনন্দ, কবে বিদ্যালয়ের অবকাশ হইবে, স্নেহময়ী মায়ের ক্রোড়ে কয়দিনের জন্য গমন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইবে। যুবক-যুবতীর আকাঙ্ক্ষা কবে পরস্পরের সন্দর্শন সুখ উপভোগে পরস্পরে আনন্দ রসে আপ্লুত হইবে। বৃদ্ধ পিতা, প্রৌঢ়া জননীর আকাঙ্ক্ষা—কবে প্রবাসী পুত্রের আনন্দপূর্ণ মুখখানি দেখিয়া স্বর্গ ভোগ অপেক্ষাও অধিক সুখ উপলব্ধি করিবেন। এক কথায় আনন্দময়ী মায়ের আমার এমনই মোহিনী শক্তি যে, এ সময় আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই কি যেন অপূর্ব্ব আনন্দে উন্মত্ত। বাঙ্গালীর এ আনন্দ পৃথিবীর আর কোন উৎসবে আছে কিনা জানি না। শোক তাপ প্রপীড়িত অতিবড় দুঃখীর প্রাণও এ সময় আনন্দের উৎফুল্ল না হইয়া থাকিতে পারে না।

আনন্দময়ী মা আমার বর্ষে বর্ষে এই-রূপ পরমানন্দ লইয়াই বাঙ্গালায় আগমন করিয়া থাকেন। বাঙ্গালার প্রান্তরভূমি-গুলি যে সময় উর্ব্বরাশক্তির প্রবল প্রাচুর্য্যে অপরিমিত ধান্যশীষে অপরূপ শোভা ধারণ করিত, সেই ক্ষেত্রজাত ধনধান্যে যে সময় বাঙ্গালীর অতিবড় গরীব গৃহস্থেরও অন্ন-বস্ত্রের অভাব হইত না, বাঙ্গালীর সর্ব্ব প্রধান সম্পদ—ধান্য এবং অন্যান্য শস্যসম্ভার যে সময় এই দেশ হইতে দেশ দেশান্তরে চলিয়া যাইত না, তাহার ফলে যে সময় টাকায় দুই মন চাউল কিনিয়া বাঙ্গালী উদর পূর্ত্তির ব্যবস্থা করিতে পারিত, শাকসব্জী তরি তরকারী পল্লীবাসীর আঙ্গিনার নিম্নদেশে—প্রাঙ্গনের পার্শ্ব ভূমিতে উৎপন্ন হইয়া বাঙ্গালীর ব্যাঞ্জনের অভাব দূর করিত, এক কথায় যে সময় সকল পল্লীবাসী বাঙ্গালীই ক্ষেত্রের ধান্য, বাগানের তরকারী, পুকুরের মৎস্য এবং গৃহ পালিত গাভীর দুগ্ধে আহারীয় অভাব আদৌ ভোগ করিত না, এবং তাহার ফলে বাঙ্গালী জাতি যে সময় সবল, সুস্থ ও দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া পরমা-নন্দে কাল যাপন করিবার শক্তি অর্জ্জন করিত, সে সময় এই শরৎকালে জগন্মাতা আদ্যাশক্তির আগমনে বাঙ্গালী যেরূপ অনির্ব্বচনীয় আনন্দে মত্ত হইতে পারিত, সেরূপ আনন্দ এখন বুঝি আর বাঙ্গালী লাভ করিতে সক্ষম হয় না। দেশে এখন নগদ অর্থ যতটা সুলভ হইয়াছে, আগে

অবশ্য এরূপ ছিল না, সেকালে টাকার মুখ খুব কম লোকেই দেখিত। তখনকার দশ টাকা, এখন একশত টাকার সমতুল্য হইয়াছে। তখন এখনকার মত এত অধিক টাকা উপার্জ্জন করিবার কল্পনাও বাঙ্গালী করিতে পারে নাই। দাস্‌খৎ লিখিয়া চাকুরী করিবার প্রবৃত্তি তো তখন বড় একটা কেহই রাখিতেন না, সে প্রবৃত্তি যাহার আসিত, তিনি অল্প বেতনেই সন্তুষ্ট হইতেন। তাহার কারণ, নগদ অর্থ দিয়া দ্রব্য কিনিবার প্রয়োজন তখন কাহারও বড় আবশ্যক হইত না, দ্রব্য-বিনিময়ে সংসারের অনেক কার্য্যই তখন সম্পন্ন হইতে পারিত। এখন তো আর তাহা হইবার উপায় নাই, প্রবৃত্তির বিপর্য্যয়ে এবং ম্যালেরিয়া-কলেরা প্রভৃতি আধিব্যাধির বিষম তাড়নায় বাঙ্গালী এখন স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির মায়া পরিত্যাগ করিয়াছে, অমরাবতী তুল্য তাহার সৌধাবলীর উপর বট-অশ্বত্থ শিকড় গাড়িয়া তাহাকে জীর্ণ, শীর্ণ ও ভগ্নপ্রবণ করিয়া তুলিতেছে, তাহার পিতৃ পুরুষের কর্ষণের জমী গুলি এখন বন্দোবস্ত করিয়া কৃষকের হস্তে সমর্পণ করা হইয়াছে, পুকুরে আর সেকালের মত মৎস্য হইবে কি—বহুকালা-বধি সংস্কারের অভাবে পুকুরগুলি তাহার মজিয়া আসিবার উপক্রম হইয়াছে। গাভী পালন—সে কার্য্য তো দেশ হইতে একে-বারেই লুপ্ত। এক কথায় বাঙ্গালী এখন দেশ ছাড়িয়া, প্রবাসে আসিয়া, যথেষ্ট অর্থের মুখ দেখিলেও ব্যয়াধিক্যে অভাবের তাড়নায় 'হা-ভাতের দল' হইয়া পড়িয়াছে। যখন সে দেশে ছিল, তখন সে পেট ভরিয়া দুই বেলা খাইতে পারিত, সেই আহার্য্যের মধ্যে ঘৃত দুগ্ধাদি পুষ্টিকর দ্রব্যের ব্যবস্থা থাকিত। তাহার ফলে চিররুগ্ন হইয়া তাহাকে অকাল বার্দ্ধক্যকে আলিঙ্গন করিতে হইত না। এখন সে প্রবাসে আসিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিলেও ব্যয়াধিক্য নিবন্ধন সেই অর্থ লইয়া যেন ছিনিমিনি খেলা করিতেছে। কলিকাতার মত প্রবাসে শৌচ কার্য্যের জন্য মৃত্তিকা পর্য্যন্ত কিনিতে হয়, সুতরাং যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিলেও অভাবতো এখানে পূর্ণ হইবার উপায় নাই, বাঙ্গালী বাঁচিবে কিসে? মাতৃপূজার মহোৎসবে সেকালের মত আনন্দে আত্মহারাই বা হইবে কিরূপে?

ইহার উপর রোগের তাড়না। পল্লী গ্রামের ম্যালেরিয়ার কথা নূতন করিয়া তুলিবার কিছুই নাই, শরৎ কালে যে সময় মায়ের আগমন, ম্যালেরিয়া-রাক্ষসী সে সময় করাল বদন ব্যাদানে পল্লীভূমিকে তো গ্রাস করিবার উপক্রম করিয়াই থাকে। বাঙ্গালার পল্লী গুলিতো এ সময় শ্মশান ভূমি। সহরের মত প্রবাসে আসিয়া ও বাঙ্গালী তাহার হস্ত হইতে অব্যাহতি পায় কই? কলিকাতায় ডেঙ্গুজ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিউমনিয়া রূপ রোগ রাক্ষসেরও এসময় প্রবল প্রতাপ। এবৎসর তো ঘরে ঘরে এগুলির দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ আরম্ভ হইয়াছে। ফল কথা, সহরে আসিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াও বাঙ্গালীর স্বস্তি কোথায়? পেটে ভাত নাই পরণে কাপড় নাই, অভাবের তাড়নায় বাঙ্গালী ব্যতিব্যস্ত, তাহার উপর রোগের জ্বালা, বাঙ্গালী আর

মাতৃপূজায় অভিনিবিষ্ট হইবে কেমন করিয়া? কৃতকর্ম্মের ফলেই বলুন, আর গ্রহবৈগুণ্য বশতঃই বলুন, চির শান্তি প্রিয় বাঙ্গালীজাতি বহু বৎসর হইতে যে শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে, জগন্মাতা আদ্যাশক্তি সে শক্তি অর্জ্জনের ক্ষমতা বাঙ্গালীজাতিকে পুনরায় প্রদান না করিলে তাহার পক্ষে আর আনন্দ-বিহ্বল হইবার উপায় নাই। দে মা; বাঙ্গালীকে আবার সে শক্তি আনিয়া, যে শক্তি লাভ করিয়া বাঙ্গালী একদিন এই শরদাগমে পক্ষকাল পূর্ব্ব হইতে তোমার শ্রীচরণে জবা বিল্বদল দিবার জন্য উন্মুখ হইয়া থাকিত, যে শক্তি লাভ করিয়া আনন্দময়ী মা আমার তোমার হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ট সন্তানগণ তোমার মৃন্ময়ী মূর্ত্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া, চিন্ময়ীরূপে তোমাকে দেখিয়া উল্লসিত হইয়া পড়িত, বিশ্বধাত্রী মহামহিম মহিমাময়ী মা আমার, বাঙ্গালীকে আবার সেই শক্তি ফিরাইয়া দাও মা! বাঙ্গালী আবার রোগের জ্বালা, শোকের জ্বালা, সর্ব্বাপেক্ষা অন্ন চিন্তার নিদারুণ জ্বালার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া তোমার উৎসবে কয়দিনের জন্য আত্মহারা হইয়া উঠুক, বাঙ্গালীর আবাল বৃদ্ধ বনিতা কয়দিনের জন্য দুঃখ কষ্ট সকল ভুলিয়া, দৈন্য-জ্বালা চিত্ত হইতে একেবারে মুছিয়া ফেলিয়া, তোমার স্নিগ্ধ মধুর মোহিনী শক্তির কণামাত্র লাভ করিয়া বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি সংহার কারিণী দুর্গতিহারিণী জননী আমার তোমার পাদপদ্মে আত্ম নিয়োগ করিতে সমর্থ হউক। দে মা বাঙ্গালীর জন্য আবার সেই ব্যবস্থা করিয়া। বিশ্বসৃষ্টির ও বিশ্বরক্ষার মূলাধার মা আমার, তুমি না করিলে বাঙ্গালীর আর সে ব্যবস্থা কে করিবে মা।

অপ্রকাশিত প্রাচীন পুঁথি।

দ্রব্য গুণ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[অধ্যাপক শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেন এম, এ,]

আঢ়কী, অরহর ডাউল। কষায়, মধুর। কফ পিত্ত নাশক, গ্রাহী।

আতুপ্য, আতা। রক্ত বর্দ্ধক, বল মাংস-কারী। দাহ, রক্ত পিত্ত নাশক বায়ু নাশক।

আদিত্য পত্র, অর্কপত্র। কটু, উষ্ণ। কফ, বাতরোগ, গুল্ম, অরুচি নাশক, মাত্রা ২ তোলা।

আমলক, কাট আমলা। কষায়, কটু; শীতল। পিত্ত দোষ নাশক মাত্রা ৪।৫ মাষা।

আমলকী। শুক্রকারী, শীতবীর্য্য, অম্ল হেতু বায়ু নাশক, মাধুর্য্য জন্য পিত্ত নাশক, রুক্ষতা হেতু কফ নাশক। দাহ, বমি, মেহ, শোথ, রক্তদোষ ও পিত্ত নাশক। তৃষ্ণা ছর্দ্দি নাশক, রসায়ন। মাত্রা ৪ মাষা—৫ মাষা।

আম্র। বলাম্র ফল। বায়ু, পিত্তকারী, কফ রোগ নাশক।

মধ্যাম্র—পিত্তকারী।

পক্কাম্র। বর্ণ, রুচি, মাংস, শুক্র ও বল কারক, বায়ু নাশক, ত্রিদোষ সমতা কারক, পুষ্টিজনক, তৃপ্তিকারক।

মধুযুক্তাম্র। ক্ষয় রোগ, প্লীহা, বাত ও শ্লেষ্মা নাশক।

ঘৃত যুক্তাম্র। বাত পিত্ত নাশক।

দুগ্ধ যুক্তাম্র। ভেদক, বাত পিত্ত ও হারক, শুক্র-বলবর্দ্ধক।

আম্র ফলাস্থি গুণ। তৃষ্ণা, ছর্দ্দি, মেহ ও অতিসার নাশক।

ত্বক গুণ। কষায়।

মূল গুণ। রুচিকারক, কষায়, গ্রাহী, শীতল।

পুষ্প গুণ। কষায়।

পল্লব গুণ। কফ পিত্ত নাশক।

আমসত্ব। তৃষ্ণা, ছর্দ্দি, বাত ও পিত্ত-নাশক, সারক।

আম্রপেষী, আমষী। ভেদক, কফ বাত নাশক।

আম্র ত্বক। কষায়, অম্ল, পিত্ত, কফ নাশক। মাত্রা ৫ মাষা।

আরগ্বধ। সোঁদালী। জ্বর, হৃদ্রোগ, বাত রক্ত, উদাবর্ত্ত, শূল, কণ্ডু, কুষ্ঠ, মেহ, বিষ্টম্ভ বাত ও পিত্তনাশক। কোষ্ঠ শুদ্ধি কর। মাত্রা ২ তোলা হইতে ৪ তোলা।

আরাম শীতলা। তিক্ত, শীতল। পিত্ত-নাশক, দাহ ও শোথ নাশক। বিস্ফোট ব্রণ রোপণ কারক, মাত্রা ৩ মাষা।

আরুক, আড়। ময়ুর, হিম। অর্শ, প্রমেহ, গুল্ম ও রক্ত দোষ নাশক। মাত্রা ২ তোলা।

আদ্রক, আদা। উষ্ণ, কটু। শোথ ও কণ্ঠরোগ নাশক (লবণ-আদা) ভোজনান্তে পথ্য। বাত কফ নাশক, সারক, কুষ্ঠ ও পাণ্ডু নাশক। মাত্রা ১ তোলা।

আলু। রক্ত পিত্ত নাশক, শুক্রকারক, স্তন দুগ্ধ কারক, হৃৎ কফ নাশক।

আবর্ত্তকী; লতা বিশেষ। কষায়, অম্ল। শীত বীর্য্যকারী, পিত্ত নাশক।

আশুধান্য। পিত্তকারী।

আহুলা, কাঞ্চন পুষ্প। তিক্ত, শীতল। চক্ষুরোগে হিতকারী। পিত্তদাহ, মুখরোগ, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, শূল ও ব্রণনাশক। মাত্রা ২ তোলা।

ঈঙ্গুদী, জীয়াপুতা, লতাফটকী। কটু, উষ্ণ, ফেনিল, রসায়ন, ব্রণ নাশক। মাত্রা ২ মাষা।

ইন্দ্র চৌভিটী, যুগ্ম ফল, লতা বিশেষ। কটু, শীতল, পিত্ত শ্লেষ্মা, কাস, দোষ, ব্রণ ও ক্রিমি নাশক।

ইন্দ্র যব। কটু, তিক্ত, শীতল। কফ, বাত, রক্তপিত্ত, দাহ ও অতিসার, বমনকারক। জ্বর দোষ নাশক। কুষ্ঠ নাশক, জ্বরা তিসার, রক্তার্শ, কৃমি বিসর্পনাশক মাত্রা ৩ মাষা।

ইন্দ্রবারুণী। শ্বাস, কাস নাশক, কুষ্ঠ, গুল্ম, গ্রন্থি, ব্রণ নাশক, প্রমেহ, মূঢ় গর্ভ, গণ্ডমালা, ও বিষ নাশক; কামলা, পিত্ত, প্লীহা, উদরী নাশক, কৃমি নাশক, জ্বর নাশক। মাত্রা ২ হইতে ৪ রতি।

ইর্ব্বারু; কাঁকুড়। অজীর্ণকারী। শীতল পক্ক ফল দাহ ছর্দ্দি তৃষ্ণা নাশক। ক্লান্তি নাশক।

ইক্ষু। রক্ত পিত্ত নাশক, বল, শুক্র, কফ কারী. মূত্র শুদ্ধিকারক, রক্তবর্দ্ধক, ভ্রম নাশক, ত্রিদোষ নাশক, সারক, রুচিকর।

ইল্লিশ। পিত্ত, শ্লেষ্মা, অগ্নি বৃদ্ধিকারক। পিত্ত কারক। পিত্তকারক, কফ কারক, বায়ু নাশক।

উড়ম্বর। কফ পিত্ত নাশক, ব্রণ শোধন ও রোপণ কারক, রক্ত পিত্ত, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা ও দাহ নাশক, গর্ভ রক্ষক। মাত্রা ২ তোলা, ছালের মাত্রা ৫ মাষা।

উৎপল। পিত্ত কফ নাশক। দাহ, শ্রম বমি, ভ্রান্তি, কৃমি ও জ্বর নাশক।

উৎপলিনী; কুমুদিনী। হিম, তিক্ত, পিত্ত নাশক, রক্তামাশায় বাত, কফ, কাস, তৃষ্ণা, শ্রম ও বমি শমতা কারক,। বীজগুণ রুক্ষ, হিম, গুরু।

উদধি মল, সমুদ্র ফেণা। শীতল, কষায়, অতিবান্তি কারক, অর্থাৎ বমন কারক। মাত্রা ১ মাষা।

উপচক্র, চক্রবাক পক্ষি বিশেষ। মাংস গুণ লঘু, স্নিগ্ধ, উষ্ণ বীর্য্য, বলাগ্নি বৃদ্ধি কারক।

উপোদকী, পুঁই শাক। কষায়, উষ্ণ, কটু, মধুর। নিদ্রা, আলস্য, বিষ্টম্ভ ও শ্লেষ্ম কারী বল্য।

উশীর, বেণামূল। ঘর্ম্ম, দৌর্গন্ধ, দাহ ও পিত্তরক্ত রোগ নাশক। মাত্রা ২ তোলা।

উষ্ট্রাণ্ডী, পুষ্প বিশেষ।—তিক্ত, উষ্ণ। রুচিকারক, হৃদ্রোগ নাশক। বীজ বৃষ্য।

উষ্ট্র।—দুগ্ধ,—কুষ্ঠ, শোথ, অর্শ, কৃমি, শূল ও উদরী নাশক। দধি—অর্শ, কুষ্ঠ, কৃমি, শূল, ও উদরী নাশক। নবনীত—ব্রণ কৃমি, বাত ও বিষ নাশক। ঘৃত—কুষ্ঠ, কৃমি, বিষ, বাত, কফ, গুল্ম ও উদরী নাশক। মাংস—বীর্য্য বর্দ্ধক।

এড়গজ—চাকুন্দিয়া।—বায়ু কফ, কুষ্ঠ, ত্বগ্দোষ, গুল্ম, উদরী ও অর্শ নাশক।

এণ হরিণ। মাংস—কষায়, মধুর পিত্ত রক্ত কফ ও জ্বর নাশক, সংগ্রাহী, রুচি কারক, হৃদ্য. বলকারী।

এরকা, তৃণ বিশেষ।—হিম। শুক্রবৃদ্ধি কারক। চক্ষুরোগে হিতকারী, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী দাহ ও পিত্ত শোণিত নাশক। মাত্রা ১ তোলা।

এরণ্ড মৎস্য ভেদ।—মধুর, স্নিগ্ধ, গুরু।

এরণ্ড।—তৈল, মধুর, গুরু, অতি শ্লেষ্ম বর্দ্ধক, বাতরক্ত, গুল্ম, হৃদ্রোগ, জীর্ণ, জ্বর-নাশক, কৃমিদোষ নাশক, শূল, কুষ্ঠ নাশক, আমবাত নাশক, জ্বরকাস নাশক। মাত্রা ২৪ মাষা হইতে ৩০ মাষা।

মূল—শূল, বায়ু-কফনাশক, শুক্রকারী। স্নেহ মধ্যে এরণ্ড তৈল শ্রেষ্ঠ বিরেচক। চূর্ণ মধ্যে তেউড়ি। রস মধ্যে কারবেল্ল, ফল মধ্যে হরীতকী।

এলজ, মৎস্যভেদ।—মধুর, বৃষ্য, সংগ্রাহী, কফ, বাতনাশক, মেধা ও অগ্নি বৃদ্ধিকারক।

এলবালুক, লালুকা।—উগ্র, কষায়, কফ, বাত, মূর্চ্ছা, ও জ্বরদাহ নাশক, পরম রুচি কারক।—মাত্রা—১ মাষা।

এলা।—শীতল, তিক্ত, উষ্ণ, সুগন্ধি। পিত্তরোগ ও কফনাশক, বান্তিনাশক শূল, তৃষ্ণা, ছর্দ্দি, বায়ুনাশক, কোষ্ঠবদ্ধ নাশক, কফ, শ্বাস কাস ও মূত্রকৃচ্ছ্রনাশক মাত্রা—১ মাষা।

ওকুল, গোধুম কৃত তপ্ত পক্বপিষ্টক বিশেষ গুরু, বৃষ্য, বল্য, রক্তবাত নাশক। মধুর, স্নিগ্ধ।

ওড়িকা, উড়িধান।—শোথ, রুক্ষ, কফ-বায়ুবর্দ্ধক, পিত্তনাশক।

ওল্ল, ওল।—অগ্নিদীপন, রুচি কারক, কফনাশক। লঘু, অর্শঘ্ন। মাত্রা—১০ তোলা।

ওষণী, শাক বিশেষ।—কফ, বায়ুনাশক।

ঔদ্দালক, মধু বিশেষ।—কুষ্ঠরোগ নাশক। বিষ রোগ নাশক। মাত্রা —২ তোলা।

ঔদ্ভিদ।—তীক্ষ্ণ, উৎক্লেদকারী, ক্ষারযুক্ত, কটু, তিক্ত কোষ্ঠবদ্ধ, আনাহ, ও শূল নাশক। মাত্রা ৫ মাষা।

ঔষরক, খারীলবণ।—কটু, ক্ষার, তিক্ত, বাত কফনাশক। বিদাহি, পিত্তকারী, মল বদ্ধ, ও মূত্র সংশোধনকারী। মাত্রা—২ তোলা।

কক্কোল, কাঁকলা। কটু, তিক্ত, উষ্ণ-দীপন, পাচন, রুচিকারক। কফ বাতরোগ নাশক। মাত্রা। ৩ মাষা।

কঙ্কলোড্য, চিঙ্কোড়মূল।—গুরু, শীতল। অজীর্ণকারী। মাত্রা—৩ মাষা।

কুকুঠ, পার্ব্বতীয় মৃত্তিকা বিশেষ।—কটু, উষ্ণ। কফ, বাত, ব্রণ ও শূলনাশক; রেচক। মাত্রা—২ মাষা।

কচ্ছু।—ধাতু শোষক, রুক্ষ, পিত্তশ্লেষ্ম-নাশক, বায়ুবর্দ্ধক, পুষ্টিকারী, ভগ্নসন্ধানকারী, পিত্ত-দাহনাশক। মাত্রা—১ তোলা।

কচ্ছপ।—মাংস—বাতনাশক, শুক্রবৃদ্ধি-কারক, চক্ষুরোগে হিতকারী, বল্য, মেধা স্মৃতিকর, শোথনাশক। চর্ম্ম—পিত্তনাশক। পাদ —কুষ্ঠনাশক। অণ্ড—বাজীকর।

কচু।—ভেদক, গুরু, কটু, আম, বায়ু ও পিত্তকারী।

কঞ্চট, কাঁচড়াদাম।—শ্লেষ্মকারী, ধারক, হিম, রক্ত পিত্তনাশক, বায়ুহর।

কটভী, নয়া কটকী, জ্যোতিষ্মতীলতা।—কটু, উষ্ণ, গুল্ম, বিবান্ধান, শূলদোষনাশক; বাত; কফাজীর্ণনাশক। কফ ও শুক্রকর। মাত্রা ২ মাষা।

কটুকা, কটকী।—কটু, তিক্ত, শীত, রক্তপিত্ত, দাহ, শ্বাস, ও জ্বর নাশক। সারক, কফ নাশক, কৃমিঘ্ন। মাত্রা ৫ মাষা।

কটুতুণ্ডী; কটুতরই।—কটু, রেচক, রক্ত-পিত্তনাশক।

কটুতুম্বী, তিৎলাউ।—কটু; তীক্ষ্ণ, বান্তিকারক, শ্বাস, বাত, শোথ, ব্রণ ও শূল, বিষনাশক; পাণ্ডু, কৃমি, কফ ও বায়ুনাশক, প্লীহানাশক, উদরীনাশক। মাত্রা ১ রতি।

কটফল-কায়ফল। তিক্ত, কটু। বাত, কফ, জ্বর, শ্বাস, প্রমেহ, অর্শ, কাস ও—অরুচিনাশক। মুখরোগনাশক। মাত্রা ২ হইতে ৮ রতি।

কট্টি—লতা বিশেষ।—মধুর, শীত, কফ, শ্বাস, ও জ্বরনাশক। রাজযক্ষা নিবারক। মাত্রা ৩ মাষা।

কণগুগ্‌গুল। কটু, উষ্ণ, সুগন্ধি। বাত, শূল, গুল্ম, উদরাধ্মান ও কফনাশক। রসায়ন মাত্রা ২ মাষা।

কণ্টকারিকা। কটু, তিক্ত, উষ্ণ, দীপন। শ্বাস, কাশ, প্রতিশ্যায় দোষ, কফ, বাত ও জ্বরনাশক, তৃষ্ণানাশক, কণ্ডু,কুষ্ঠ, ও কৃমিনাশক, পীনস ও পার্শ্বপীড়ানাশক, মাত্রা ২ তোলা।

কণ্টকী-কাঁটাবেগুন। কটু, তিক্ত, উষ্ণ। কণ্ডুনাশক।

কণ্টাফল,কাঁঠাল। পক্কফল-গুণ-রক্তবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, বাত পিত্তনাশক। শ্লেষ্ম-শুক্র-বলপ্রদ, বৃহণ, মাংসল।—বীজ—পিত্তনাশক ভ্রম-নাশক।

কদম্ব।—তিক্ত, কটু, কষায়, পিত্ত-নাশক, বাত; কফনাশক; শুক্রবর্দ্ধক, মাত্রা ২৷৷০ তোলা রস।

কদলী, কলা। পক্কফল কষায়, মধুর, বলকারী, শীতল, শুক্রবৃদ্ধিকর, পিত্তনাশক, ভ্রমনাশক, তৃষ্ণানাশক, হৃদ্য, কফ, কৃমি-নাশক। কুষ্ঠ, প্লীহা ও জ্বরনাশক। বস্তি শোধক। মূল—বলকারক, বাতপিত্ত-নাশক।

কদ্বারী।—কটু, তিক্ত, উষ্ণ। কফ, বাত, শোথ, রক্তগ্রন্থি ও জ্বরনাশক। দীপন, রুচিকারক। মাত্রা ৩ মাষা।

কপর্দ্দক, কড়ি।—কটু, তিক্ত, উষ্ণ। কর্ণশূল; ব্রণ, ওজ, শূল ও নেত্রদোষ নাশক।

কপিকুচ্ছ, আলকুশী। স্বাদুরস, শুক্রবৃদ্ধি-কারী; বাত, ক্ষয় ও ব্রণনাশক। বীজগুণ, বাত শমনকারী, পরম বাজীকর, কফ. বাত নাশক। মাত্রা ১ তোলা।

কপিঞ্জল; চাতকপক্ষী।—মাংসগুণ—লঘু; শীত, কফ ও রক্ত পিত্তনাশক। অগ্নি-কারক। শুক্রবৃদ্ধিকর।

কপিত্থ, কতবেল।—অম্ল, উষ্ণ। কফ নাশক, গ্রাহী, বায়ুবর্দ্ধক। কণ্ঠরোগ-কারী, বিবহর, রুচিকর। শ্বাস, বমি, ভ্রম, ক্লম হর, কণ্ডুয়। মাত্রা ৪ তোলা।

কপিলদ্রাক্ষা, কিসমিস। মধুর শীত, হৃদ্য। দাহ, মূর্চ্ছা, জ্বর, শ্বাস, তৃষ্ণা ও হল্লাস নাশক।

কপোত।—বীর্য্য ও বলবৃদ্ধিকারক, বাত-পিত্তনাশক।

কমল।—শীতল, স্বাদু, রক্তপিত্ত ও ভ্রমনাশক। সন্তাপনাশক। মাত্রা ৪ তোলা

কম্পিল্লক, কমিলা।—বিরেচক, কটু, উষ্ণ। ব্রণ, কফ, কাস ও কৃমিনাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

করঞ্জ।—ফলগুণ—কটু, উষ্ণ। চক্ষু-রোগে হিতকারী, বাতনাশক। কফ, মেহ, অর্শ, কৃমি ও কুষ্ঠনাশক। পত্রগুণ।—কফ, বাত, অর্শ, কৃমি ও শোথনাশক, ভেদক ও পিত্তবর্দ্ধক। তৈল—বাতনাশক; কুষ্ঠ, কণ্ডু ও বিসূচিকানাশক। তীক্ষ্ণ, উষ্ণ। লেপনে নানাবিধ চর্ম্মদোষনাশক।

করমর্দ্দক।—পক্ক ফল—ত্রিদোষনাশক, অরুচিবিষনাশক, পিপাসানাশক।

করবীর, অশ্বত্থ।—কটু, তীক্ষ্ণ। দুষ্ট কণ্ডুনাশক। ব্রণ বিস্ফোটকশমনকারক। মাত্রা ৷৷০ রতি।

করীর, বাঁশের কোঁড়া।—শ্লেষ্মানাশক। কষায়, দাহজনক।

করীষ, উষ্ট্রপ্রিয়কণ্টকবৃক্ষ।—আধ্মানকারী, কষায়, কটু, উষ্ণ, শ্বাসনাশক, শূলনাশক ব্রণদোষনাশক।

করুণ, করুণা লেবু।—ফলগুণ—কফ, বায়ু, আম ও মেদনাশক।

করুণী, পুষ্পবৃক্ষবিশেষ।—কটু, তিক্ত, উষ্ণ। বায়ু কফনাশক।

কর্কট।—বায়ুপিত্তনাশক, বলকারী।

কর্কট শৃঙ্গী।—তিক্ত গুরু, উষ্ণ। বায়ু, হিক্কা, অতিসার, কাশ ও শ্বাসনাশক। মাত্রা ৪ মাষা।

কর্কটী, কাঁকুড়।—মধুর, শীতল, রক্ত-পিত্তনাশক, কফদোষকারী, মূত্ররোধ নাশক।

কর্কোটক, কাঁকরোল।—শুক্র-কফপিত্ত নাশক, রুচিকারক, মাত্রা ২ তোলা।

কচ্চুর, কচুর।—কটু, তিক্ত, উষ্ণ। কফ, কাস ও গলগণ্ডদোষনাশক।

কর্ণস্ফোটা কানফাটা, লতাবিশেষ।—কটু, তিক্ত, হিম। সর্ব্ববিধ, গ্রহভূতাদি দোষ ও সর্ব্বব্যাধিনাশক। মাত্রা ১ তোলা।

কর্দ্দম, কাদা।—শীতল, রুক্ষ, ব্রণশোধন ও রোপণকারক; শোথনাশক। বিষরোগ, বেদনা ও দাহনাশক;

কর্পূর।—শিশির, তিক্ত, কটু। শ্লেষ্ম, রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা, বিদাহ ও কণ্ঠস্থদোষ নাশক মাত্রা ৪ রতি।

কর্ব্বুদার, শ্বেতকাঞ্চন।—গ্রাহী, রক্ত-পিত্তনাশক। মাত্রা ২ তোলা।

কর্ম্মরঙ্গ, কামরাঙা।—অম্লপিত্তকারক, মধুরাম্ল, বলপুষ্টিকারক।

কলমধান্য, শালিধান্যবিশেষ।—রক্তদোষ ও ত্রিদোষনাশক, চক্ষুরোগে হিতকারী।

কলম্বা।—স্তন্যদুগ্ধ শুক্র শ্লেষ্মকারী, মধুর কষায়। মাত্রা ৭২ রতি। শুষ্ক ৫ তোলা।

কলায়, মটর, বাঁটুল। বাত, রুচিপুষ্টি ও আমদোষকারী, পিত্ত, দাহ ও কফ নাশক, শীত, কষায়, ভেদক।

কশেরুক, কেশুর।—গুরু, বিষ্টম্ভকারী, শীতল, রক্তপিত্তনাশক, দাহ ও শ্রমনাশক।

কস্তুরী।—সুরভি, তিক্ত, চক্ষুরোগে হিতকারী, কফদৌর্গন্ধনাশক, রক্তপিত্ত ও সর্দ্দিনাশক। মাত্রা ২ রতি।

কাংস্য।—তিক্ত, উষ্ণ, চক্ষুরোগে হিতকারী, বাত কফ বিকারনাশক। রুক্ষ কষায়, রুচিকারী, লঘু, দীপন, পাচন, সারক, ও পিত্তনাশক। মাত্রা ১ রতি।

কাকমাংস।—ক্ষয়নাশক। চক্ষুরোগে হিতকারী।

কাকজঙ্ঘা। তিক্ত, উষ্ণ। কৃমি, কফ ও বীর্য্যনাশক। বিষমজ্বরনাশক। মাত্রা ৩ মাষা।

কাকতিন্দুক, মাকড়াগাব।—কটু, উষ্ণ, তিক্ত রসায়ন। বাতদোষ নাশক। পলিত স্তম্ভিত। মাত্রা ।০ রতি।

কাকমাচি, গুড়কামই।—কটু, তিক্ত উষ্ণ, কফ, শূল, অর্শ, শোথ, কুষ্ঠ ও কণ্ডু-নাশক। ত্রিদোষ নাশক, ভেদক। মাত্রা ২ তোলা।

কাকলী দ্রাক্ষা, বেদানা, কিসমিস।—মধুর, অম্ল, রসাল। রুচিকারক, শ্বাস ও হৃল্লাস নাশক।

কাকোদুম্বরিকা, কাকডুমুর।—শীত কষায়, ব্রণনাশক, গর্ভরক্ষক, স্তনদুগ্ধ-কারক।

কাকোলী।—শীতল, মধুর, ক্ষয়, পিত্ত, বায়ু, রক্তদাহ ও জ্বর নাশক, কফ শুক্র বর্দ্ধক।

কাচলবণ, কালালবণ, বিটলবণ।—পিত্ত কারী, কফ, বাত, গুল্ম ও শূল নাশক। অগ্নিদীপনকারক। মাত্রা ।০ তোলা।

কাঞ্জিক।—বাত, শোথ, পিত্তজ্বর, দাহ, মূর্চ্ছা, শূল, ও আধ্মান নাশক। হৃদ্‌রোগ

নাশক; পাণ্ডু ও কৃমিরোগ নাশক। অগ্নিকারক।

কাতল।—উষ্ণ, মধুর, গুরু, ত্রিদোষকারী।

কাদম্ব, বালিহংস।—বায়ু ও রক্তপিত্ত নাশক, ভেদক, শুক্রকারক।

কানক, জয়পালবীজ।—তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, সারক। মাত্রা ॥০ রতি।

কারবেল্ল।—ধারক; রক্তপিত্তরোগনাশক, রুচিকর।

কার্পাসী।—মধুর, শীত,। স্তনদুগ্ধকারী। পিত্ত, কফ, তৃষ্ণা ও মূর্চ্ছা নাশক। বল্য, ভ্রান্তি নাশক।

কালশাক।—সারক, রুচিকর, বল্য, বায়ুকর, কফ ও রক্তপিত্ত নাশক।

কালিঙ্গু, তরমুজ। শীতল, গ্রাহী, গুরু। শুক্রনাশক, পিত্তনাশক, কফবাতকারী।

কাশকেশ্যা।—রুচিকর, পিত্তদাহ নাশক, বল্য, শুক্রকারী, শ্রম, শোষ ও কফ নাশক। মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক, মাত্রা ২ তোলা।

কাষ্ঠকদলী।—রুচিকর, রক্তপিত্ত নাশক, হিম, গুরু, মাত্রা ৫টী।

কাসীস, হিরাকষী।—কষায়, শিশির। বিষ, কুষ্ঠ, কৃমি নাশক। চক্ষুরোগে হিতকারী, কান্তিবর্দ্ধক। মাত্রা ২ রতি।

কিঞ্জল্ক, নাগকেশর।—মধুর, রুক্ষ, কটু, আম্ল, ব্রণ নাশক; পিত্ত, তৃষ্ণা ও দাহ নাশক, শোথ নাশক।

কিরাততিক্ত, চিরতা, ভূনিম্ব। বায়ু বৃদ্ধিকর, রুক্ষ, কফপিত্তজ্বর নাশক, সারক, কৃমিঘ্ন সান্নিপাতিকজ্বর, শ্বাস ও দাহ নাশক, কাস, শোথ, কুষ্ঠ ও ব্রণ নাশক। মাত্রা ১০ মাষা হইতে ২ তোলা।

কিলাট, ছানা।—স্নিগ্ধ, গুরু, বৃষ্য, পিত্ত নাশক।

কুকুন্দর; কোকণিম, কুকুরশাকা।—কটু, তিক্ত, জ্বর, রক্তকফ নাশক। মূল—মুখ শোষ নাশক; মাত্রা ১ তোলা।

কুক্কুট।—বৃংহণ, চক্ষুরোগে হিতকারী। শুক্র ও কফকারক, বাত, পিত্ত, ক্ষয়, বমি ও বিষমজ্বর নাশক।

কুঙ্কুম কেশর।—সুরভি, তিক্ত, কটু, উষ্ণ,। কাস, বাত, কম্পরোগ, মূর্দ্ধশূল ও বিষদোষ নাশক। কান্তিকর, রেচক, কণ্ডু নাশক, বল্য, ত্বগ্দোষ নাশক। মাত্রা ৪ রতি।

কুটজ, কুড়চি।—তিক্ত, উষ্ণ, কষায়। অতিসারনাশক, রক্তপিত্ত ও ত্বগ্দোষনাশক, অর্শঘ্ন, কফনাশক; দীপন, রুক্ষ, সংগ্রাহী, হিম। মাত্রা ২ মাষা।

কুর্ণঞ্জর, বনবেতুয়া।—মধুর, রুচিকারক, দীপন, পাচন, ত্রিদোষনাশক, সংগ্রাহী, পিত্তশ্লেষ্মানাশক।

কুন্দ।—শীত, লঘু, কফপিত্তনাশক, সারক, দীপন; পুষ্প—গ্রাহী।

কুন্দুরু।—মধুর, তিক্ত, তীক্ষ্ণ। ত্বগ্দোষনাশক, দাহনাশক, প্রদরনাশক, জ্বরনাশক।

কুমুদ। শীতল, স্বাদু, তিক্ত। কফ, রক্তদোষ, দাহ; শ্রম ও পিত্তনাশক।

কুষ্মাণ্ডী, গোল লাউ।—মধুর, শীতল, কফপিত্তনাশক। শ্বাস, কাস ও জ্বরনাশক।

কুম্ভিকাপানা।—মূত্রকারক। মাত্রা ২ মাষা।

কুলঞ্জন।—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, দীপন। মুখদোষনাশক।

কুলত্থ।—কফ, বাত, গুল্ম, শুক্রাশ্মরী, শ্বাস, কাস ও প্রমেহনাশক। বৃংহণ, গ্রাহী। মাত্রা ১০ তোলা।

কুশ।—ত্রিদোষনাশক। মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, তৃষ্ণা, বান্তিরোগ ও প্রদরনাশক। মাত্রা ২ তোলা।

কুষ্ঠ, কুড়।— উষ্ণ, কটু, স্বাদু, শুক্রল, বিসর্পনাশক, কাসনাশক, বায়ুকফনাশক, জ্বরঘ্ন, শোথনাশক; অরুচি ও শ্বাসনাশক, পার্শ্বশূলনাশক; কুষ্ঠ, কণ্ডু, ও রক্তনাশক। হিক্কানাশক। মাত্রা ১০ মাষা।

কুষ্মাণ্ড, কুমড়া। বৃংহণ, বৃষ্য, বস্তিশুদ্ধিকর। বাতনাশক, রক্তপিত্ত, মূত্রাঘাত, প্রমেহ ও অশ্মরীনাশক, রক্তপিত্তনাশক, জীর্ণাঙ্গপুষ্টিকারক, শুক্রকারী, অরুচিনাশক, বলকারী। মাত্রা ২০ তোলা।

কুসুম্ভ, কুসুমফুল।—শাক মধুর, কটু, উষ্ণ, দৃষ্টিপ্রসাদনকারী, অগ্নিকারক, রুচিকর, কফনাশক, পিত্তকারী।

কুশরা।—শুক্রবলকারী, পিত্তকফদায়ক।

কৃষ্ণজীরক, কেলেজীরা। কটু, উষ্ণ, কফ, শোথ ও জীর্ণজ্বরনাশক। অতিসারনাশক, গর্ভাশয় শুদ্ধিকারক, সংগ্রাহী, মেধাকারী, অগ্নিদীপ্ত, বল্য, রুচ্য, বৃষ্য, আধ্মাননাশক, চক্ষুষ্য। মাত্রা ২ মাষা।

কৃষ্ণ ধুস্তুরক—কটু, উষ্ণ, কান্তিকর। ব্রণ, কণ্ডু, জ্বর ভ্রম নাশক। মাত্রা ১ বীজ।

কৃষ্ণ মুদ্গ। ত্রিদোষ ও দাহনাশক, বলবীর্য্য পুষ্টিদায়ক, মধুর, লঘু।

কৃষ্ণমৃৎ।—ক্ষত দাহ, প্রদর, শ্লেষ্ম ও পিত্তনাশক।

কৃষ্ণশালি।—ত্রিদোষ ও দাহনাশক, পুষ্টিকর, বীর্য্যবর্দ্ধক, বর্ণকান্তি ও বলকারক।

কৃষ্ণসার। মাংস—সংগ্রাহী, রুচিবলকারক, জ্বরনাশক।

কৃষ্ণাগুরু।—কটু, উষ্ণ, তিক্ত, (লেপে) শীতল। (পানে) পিত্তহর, কর্ণাক্ষিরোগনাশক। মাত্রা ১ মাষা।

কৃষ্ণার্জক, কালতুলসী। কটু, উষ্ণ। কফ, বাত, নেত্র রোগনাশক। মাত্রা বীজ ৩ মাষা।

কৃষ্ণেক্ষু, কাজলা ইক্ষু। ত্রিদোষনাশক।

কেতকী। মধুর, তিক্ত, কটু। কফনাশক। বর্ণকারী, লঘু, দুর্গন্ধ নাশক, বৃংহণ পিত্ত কফনাশক রসায়ণ, মাত্রা ৫ মাষা।

কেমুক, কেউ। মূল—কফপিত্ত নাশক, অগ্নিকারক। গ্রাহী, জ্বর, কুষ্ঠ, কাস ও প্রমেহ নাশক। মাত্রা ১ তোলা।

কেশরাজ। কটু, তিক্ত, রুক্ষ। কফবাত নাশক। কেশ্য, স্বচ্য, চক্ষুষ্য, কৃমিঘ্ন শ্বাস-কাস-শোথ নাশক। দন্তরোগ নাশক রসায়ন, বল্য, কুষ্ঠ ও নেত্ররোগ নাশক, শিরোবর্ত্তিনাশক, অগ্নিকারক, পাণ্ডুনাশক, খিত্র নাশক। মাত্রা রস ২৷৷০ তোলা।

কোকিলাক্ষ, কুলিয়াখাড়া।—আমবাত ও বাতরক্ত নাশক, পিত্তাতিসার নাশক, শুক্রকারী মাত্রা ১ তোলা।

কোদ্রব, কোদা।—বাতল, গ্রাহী, পিত্ত কফ নাশক, মধুর, তিক্ত রুক্ষ।

কোল, বদরিফল।—শুক্রল, বৃংহণ; পিত্ত-দাহ, ক্ষয় ও তৃষ্ণা নাশক। বায়ু কফ নাশক। পক্ক ফল—বায়ু পিত্ত নাশক। মজ্জা-ছর্দ্দিনাশক।

কোবিদার, রক্তকাঞ্চন বৃক্ষ।—হিম, গ্রাহী, শ্লেষ্ম পিত্ত নাশক; কৃমি কুষ্ঠ, গুদ-ভ্রংশ, গণ্ডমালা ও ব্রণ নাশক। প্রদর নাশক ক্ষয়কাস, মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক, রক্তপিত্ত নাশক। মাত্রা ২ তোলা।

কোশাতকী—ঝিঙ্গা।—শিশির, কষায়। পিত্ত, বাত, কফ নাশক। মলাধ্মান শোধক।

মহাকোশাতকী, ঘেলুয়া, ধুতুল।—পিত্ত-বায়ু নাশক, শ্বাস জ্বর ক্রিমি নাশক।

কোষাতিকা, ঘোষালতা।—ফল কফার্শ নাশক, আমাশয় শুদ্ধি কারক।

খটী, খড়ী।—মধুর, শীতল। পিত্ত, দাহ ব্রণদোষ ও নেত্র রোগ নাশক। অম্ল পিত্ত নাশক। মাত্রা ২ মাষা।

খড়্গী, গণ্ডার।—মাংস বলকারী বৃংহণ, গুরু। কফ ও বায়ু নাশক, কষায়, মূত্রবন্ধকারী, আয়ু বৃদ্ধিকারী।

খদির।—শীতল, দন্ত্য, কণ্ডু, কাস, অরুচি, মেদ, কৃমি মেহ, জ্বর, ব্রণ, শ্বিত্র, শোথ, পাণ্ডু ও কুষ্ঠ নাশক। বিসর্প নাশক, মাত্রা ১ মাষা হইতে ২ মাষা।

খর্জ্জুর।—মধুর শীতল, গুরু। ক্ষয়, অভিঘাত, দাহ, বাত ও পিত্ত রোগ নাশক। বৃংহণ, শুক্রবৃদ্ধিকারক, গুরু, পিত্ত নাশক, তৃষ্ণা নাশক, কাস-শ্বাস নিবারক।

খপর্রীতুত্থ।—কটু, তিক্ত। চক্ষুহিত, রসায়ন, মেহদোষ শমনকারী। মাত্রা ১ রতি

খলিশ।—গ্রাহী, কষায়। বায়ু কোপন-কারী, রুক্ষ, লঘু, শূল নাশক, আমনাশক।

খাখস, পোস্তদানা।—বল্য, বৃষ্য, বায়ু নাশক।

খদির সার।—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, কফ, বাত, ব্রণ ও কুষ্ঠরোগ নাশক।

(ক্রমশঃ)

সফল চিকিৎসা।

(কবিরাজ শ্রীইন্দু ভূষণ সেনগুপ্ত ভিষগ্‌রত্ন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এল, এ, এম, এস, এচ এম বি)

ছুলি রোগে—পাতিলেবুর রসে হরিতাল ঘসিয়া সূর্য্যপক্ক করিয়া দুই তিনবার দিবসে প্রলেপ দিলে ছুলি আরোগ্য হয়।

মুখে রক্ত উঠিলে—গোলাপ এক তোলা, কেওড়ার আরক একতোলা, কচি ডুমুরের রস দুই তোলা, মিশ্রি এক-তোলা একত্র করিয়া দুই তিন দিবস খাইলে রক্তউঠা ভাল হয়।

গণ্ডমালা হইলে—বামুনহাটির শিকড়—আতপ চাউলের চালধির সহিত

বাটিয়া ফোড়া, কোলা ও ঘায়ে পাঁচ সাত দিবস প্রলেপ দিলে পীড়া আরোগ্য হয়।

দন্তের গোড়ায় বা জিহ্বায় ঘা হইলে—গোয়ালিয়া লতার পাতা মোটা ডাটা ডুমাডুমা করিয়া কাটিয়া গব্য ঘৃতে ভাজিয়া লইবে। পরে চুঁয়া ঘৃতের সহিত ঐ ভাজা ডাঁটা বাটিয়া অবলেহ করিয়া ঐ ঘায়ে দুই তিন দিবস দিলে আরোগ্য হইবে।

মুখের ঘায়ে—দন্তের গোড়ায় নালী হইয়া পুঁজ পড়িতে থাকিলে গবভেরেণ্ডার আটা এক তোলা, চারি আনা লবণ মিশ্রিত করিয়া পিত্তলের পাত্রে গরম করিয়া দন্তের গোড়ার দুই দিকে দিয়া কিছুক্ষণ পরে ধুইয়া ফেলিবে। দিনে দুই তিনবার প্রয়োগ্য।

কান পাকিলে—(১) গোলাপ ফুলের আতর শিশি করিয়া রৌদ্রে গরম করিয়া কর্ণে দিলে কান পাকা ভাল হয়।

(২) সর্ষপ তৈল অগ্নিতে চড়াইয়া একটা বা দুইটা শামুক তাহাতে ভাজিয়া ঐ তৈল ছাঁকিয়া কর্ণে দিলে কান পাকা ভাল হয়।

(৩) শঙ্খের গুঁড়া গরুর চোণাতে মিশ্রিত করিয়া কর্ণে পুরিয়া ক্ষণকাল রাখিলে কান পাকা ভাল হয়।

মুখ দিয়া রক্ত উঠিলেযদি—মুখ দিয়া হঠাৎ অধিক পরিমাণে রক্ত উঠিতে দেখা যায়, তবে কেশুরিয়ার জল এক ছটাক খাইতে দিবে, পরে অতি কচি ডুমুর ঘৃতে ভাজিয়া অর্দ্ধপোয়া খাইতে দিবে। নাক দিয়া রক্ত উঠিলে সদ্য ঘৃতের নস্য লইলে নাক দিয়া রক্ত পড়া ভাল হয়।

(২) পুরাতন ঘৃত ও চামিলি ফুলের তৈল ব্রহ্মতালুতে মাখিলে নাক দিয়া রক্ত পড়া ভাল হয়।

ছেলেদের দাঁত না উঠিলে—যদি ছেলেদের দাঁত না উঠে, তবে নরুণ দিয়া সেই জায়গার মাড়ি কিঞ্চিৎ চিরিয়া দিলে দন্ত উঠিবে।

মাথায় উকুন হইলে—চাপা ফুলের পাতার রস চুলে মাখিয়া শুকাইবে। পরে জলে ধুইয়া ফেলিবে, ইহাতে মাথার উকুন মরিয়া যায়।

(২) রাত্রে শয়নকালে পানের রস পায়ের তালুতে মাখিলে উকুন মরিয়া যায়।

চোখ উঠায়—পাতি লেবুর রস দিয়া পাতিলেবুর শিকড় বাটিয়া চক্ষুর নীচে ও উপরে প্রলেপ দিবে।

চক্ষুতে ছানি হইলে—শ্বেত পুনর্ণবার শিকড় পুরাতন ক্লাজির সহিত ঘষিয়া চক্ষে দিলে ছানি ভাল হয়।

চক্ষুতে নালী হইলে—লবঙ্গ মধুতে ঘষিয়া গরম করিয়া চক্ষে দিলে চক্ষের নালী ও ফোলা ভাল হয়।

শিরঃ পীড়ায়—(১) কর্পূর—চন্দনে মিশ্রিত করিয়া রগে দিলে শিরঃপীড়া ভাল হয়।

(২) অপরাজিতা ফুলের পাতার রস নস্য করিলে শিরঃ পীড়া ভাল হয়।

মাথায় টাক পড়িলে—শোধিত হরিতাল, বহেড়া, বৃহতীর মূল সমভাগে লইয়া—মধুসহ মাড়িয়া প্রলেপ দিলে টাকে চুল উঠে।

ক্ষয়কাসে—(১) হরিণের মাংস সিদ্ধ করিয়া ছাগল দুগ্ধের সহিত বাটিয়া খাইলে ক্ষয় কাস ভাল হয়।

সর্পভয় নিবারণের জন্য—পুষ্যা নক্ষত্রে শ্বেত পুনর্ণবার মূল আনিয়া ঘরে রাখিলে সর্পভয় দূর হয়।

কুকুরে কামড়াইলে—অশ্ব কুকুরের লোম কলার ভিতর করিয়া রবিবারে খাওয়াইলে কুকুরে কামড়াইলে ভাল হয়।

শিয়ালে কামড়াইলে—অশ্ব শিয়ালের লোম রবিবারে কলার ভিতর করিয়া খাওয়াইলে শিয়ালে কামড়াইলে ভাল হয়।

বিছায় কামড়াইলে—ছাগলের নাদি জলদিয়া গুলিয়া বা কাচা থাকিলে ঘসিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ ভাল হয়।

দদ্রু রোগে—(১) ধূপ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, সোহাগা ১ তোলা, কণ্টকারি ১ তোলা সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে জলদ্বারা বাটিয়া দদ্রুর উপর প্রলেপ দিলে বহু পুরাতন দদ্রুও ভাল হয়।

(২) শোধিত গন্ধক কেরাসিন তৈলসহ দদ্রুস্থানে মাখিলে দদ্রু ভাল হয়।

রক্তাতিসারে—(১) বটপাতা বাটিয়া বাসিজলের সহিত পান করিলে রক্তাতিসার ভাল হয়।

(২) আমের ছাল বাটিয়া কাঞ্জির সহিত পান করিলে রক্তাতিসার ভাল হয়।

(৩) কুড়চির ছালের রস বা কাথ সেবনে রক্তাতিসার ভাল হয়।

বাতে—অর্কমূল বাসি জলের সহিত পান করিলে বাত ভাল হয়।

কর্ণরোগে—(১) হড়হড়ের পাতার রস কর্ণে দিলে কানপাকা ও কান কটকটানি ভাল হয়।

(২) গুগ্‌গুলু জলে গুলিয়া গরম করিয়া কাণে দিলে কাণপাকা ও কাণ কটকটানি ভাল হয়।

ডাইনের দৃষ্টি হইলে—(১) হড়হড়ের পাতার রস মুখে ও নাকে দিলে ডাইনের দৃষ্টি হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

(২) সজিনার মূলের ছাল পঁচিশটা গোল মরিচ সহ বাটিয়া খাইলে ডাইনে খাওয়া ব্যক্তি ভাল হয়।

বসন্তের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার উপায়—(১) কণ্টকারির মূল মরিচের সহিত বাটিয়া খাইলে বসন্ত রোগ হয় না।

(২) হরীতকীর আঁটি ছিদ্র করিয়া সূত্র দিয়া ডান হস্তে পরিলে বসন্ত হয় না।

শিশুর জ্বরে—নাগর মুতা, হরীতকী, নিমছাল, পলতা ও যষ্টিমধু—সমভাগে লইয়া ইহাদের কাথ ঈষদুষ্ণ থাকিতে সেবন করাইলে শিশুদিগের জ্বর ভাল হয়।

শিশুর অতিসারে—(১) বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, লোধ ও অনন্তমূল ইহাদের কাথ শিশুদিগের দুর্দ্দমনীয় অতিসারে মধুর সহিত সেবনে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

(২) শুঁঠ আতইচ, মুতা, বালা ও ইন্দ্রযব ইহাদের কাথ প্রাতে ও সন্ধ্যায় পান করাইলে শিশুর সর্ব্বপ্রকার অতীসার ভাল হয়।

শক্তি বৃদ্ধির জন্য—গুলঞ্চ, অপামার্গ, বিড়ঙ্গ, শঙ্খপুষ্পী, বচ, হরীতকী, কুড় ও শতমূলী এই সমুদয় সমভাগে ঘৃতের সহিত সেবনে স্মৃতিশক্তি এত বর্দ্ধিত হয় যে, তিন দিনে সহস্র শ্লোক কণ্ঠস্থ করিতে পারা যায়।

নালী ঘায়ে—(১) শ্বেত ভেরেণ্ডার আঠা ও খদির একত্র মর্দ্দিত করিয়া নালী ঘায়ে প্রলেপ দিলে সর্ব্বপ্রকার নালী বিনষ্ট হয়।

(২) হাপরমালীর আঠা নালী ঘায়ে লাগাইলে নিশ্চয়ই নালী ঘা ভাল হয়।

কুচকী হইলে—(১) প্রথম কুঁচ্‌কী উঠিবার সময় বটের আঠা লেপন করিলে কুঁচ্‌কী বসিয়া যায়।

(২) কৃষ্ণজীরা, হবুষা, কুড়, তেজপত্র ও কুল এই সকল দ্রব্য কাঞ্জিতে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে কুঁচকী ভাল হয়।

একশিরা হইলে—শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, বহেড়া, আমলকী, ও হরীতকী, ইহাদের ক্বাথে যবক্ষার ও সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে কফ জন্য একশিরা ভাল হয়।

শোথে—হরীতকী, হরিদ্রা, বামুনহাটী, গুলঞ্চ, চিতামূল, দারুহরিদ্রা, পুনর্ণবা, দেবদারু, ও শুঁঠ ইহাদের ক্বাথ পান করিলে উদর, হস্ত, পদ ও মুখাশ্রিত শোথ অতি সত্বর প্রকাশিত হয়।

বেরিবেরি।

(কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন)

বেরিবেরি নামটা এদেশের লোকে আগে জানিত না গত ১৮৮৭ সালে বা তাহার কিছুকাল আগে হইতে এই নামটা এদেশবাসী শুনিয়াছে। শুধু শুনিয়াছে তাহাই নহে, এই রোগ সেই সময় হইতে দেখে একটা ভীষণ মারাত্মক ব্যাধি বলিয়া স্থিরীকৃত হওয়ায় ইহার নাম শুনিলেই সকলের শঙ্কার কারণ হইয়া পড়িয়াছে।

এই রোগের নামের উৎপত্তির মূল কি, তাহা এখনও সম্পূর্ণরূপে মীমাংসিত হয় নাই। ভারতবর্ষ হইতে এই রোগ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে (Beri Beri) বেরিবেরি। সরিলস্ বাসিগণ ইহার নাম দিয়াছেন (Berbiers) বারবিয়ার্স। ব্রেজিলবাসী ইহার নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন (Morbus Innominatus) মর্ব্বস ইনোমিনেটস্। বোহিয়া ইহার নাম দিয়াছেন (Sugar warks Sickness) সুগার ওয়ার্কস সিকনেস। সিংহল দ্বীপের অধিবাসীগণ ইহার নাম দিয়াছেন, (Bad Sickness) ব্যাড সিকনেস। জাপান হইতে ইহার নামকরণ হইয়াছে (Kakko) কাক্কো। বলা বাহুল্য সকল নামই বেরিবেরি সংজ্ঞাজ্ঞাপক। ডাক্তার হার্কটস (Herklotts) বলেন, হিন্দী ভাষায় ভেড়ী শব্দ হইতে বেরিবেরি শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। হিন্দী ভেড়ী শব্দের

অর্থ মেষ বা ভেড়া। হার্স্ট'সের যুক্তি—বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদিগের পাদবিক্ষেপভঙ্গীর সহিত ভেড়া বা মেষের পদক্ষেপের সৌসাদৃশ্য দেখা যায় বলিয়াই এইরূপ নাম নির্দ্দেশ হইয়াছে। হিন্দী ভাষার 'ভেরভেরী' অর্থে ক্ষত ও প্রদাহযুক্ত স্ফীতি। ম্যান্‌শন গুড (Manson good) বলেন, বেন্‌টিয়স (Bentius) কর্ত্তৃক বেরি-বেরিয়া (Beri Beria) প্রচলিত হইয়াছে এবং তাঁহার অনুমান এই নাম প্রাচ্য দেশ হইতে উদ্ভূত। কার্টার (Carter) বলেন, 'ভর' অর্থাৎ সমুদ্র হইতে "ভরি" অর্থাৎ নাবিক এবং "ভরভার" শব্দের অর্থাৎ শ্বাস-কৃচ্ছ্রতা—বলিয়া উহা হইতে বেরিবেরি উৎপন্ন হইয়াছে। কার্টারের এই অনুমানের কারণ আফ্রিকা এবং আরব দেশীয় নাবিক-দিগের মধ্যে এই রোগের প্রাদুর্ভাব খুব বেশী ছিল। কেহ কেহ বলেন, সিংহল দেশীয় কোনো দৌর্ব্বল্য বাচক শব্দ হইতে বেরিবেরি নামের উৎপত্তি হইয়াছে, কারণ মালাবার উপকূলস্থ প্রদেশে ম্যালেরিয়া, বাতব্যাধি ও অন্যান্য কারণে স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় উহার জ্ঞাপনার্থ সিংহল দেশবাসীরা এই শব্দটি প্রথম ব্যবহার করিয়াছিলেন।

এই রোগের নাম আমরা কিছুকাল হইতে শুনিলেও পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ বলেন, এই পীড়া অতি প্রাচীন কাল হইতেই বহু দেশের অধিবাসীদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল। কারণ গ্রীক, রোমান ও বহু দেশীয় পণ্ডিতগণ ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। জাপান ও চীন দেশের ইতিবৃত্তে বহু পূর্ব্বকাল হইতে ইহার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ডেন্‌মার্ক নিবাসী (Duch) জাতির যে সময়ে পৃথিবীর পূর্ব্ব মহাখণ্ডে গতিবিধি ছিল, সেই সময় তাহারা এই পীড়া ও ইহার প্রকৃতি পরিজ্ঞাত ছিল। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ব্রেজিল দেশে জনপদোদ্ধ্বংসী মূর্ত্তিতে ইহার প্রকোপ হয় এবং সেই সময় জাপানেও নাম বদলাইয়া ইহা প্রকাশ পায়।

শরীরের ত্বকগত স্নায়ুজালের অসংখ্য সূক্ষ্ম শাখা প্রশাখার বিশেষ প্রাদাহিক অবস্থা ও তদানুষঙ্গিক সর্ব্বাঙ্গীন বা আংশিক শোথ এবং হৃৎপিণ্ডের প্রসারণ প্রবণতাই বেরি-বেরির প্রকৃত সংজ্ঞা বলিয়া ডাক্তারেরা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

এই রোগের আক্রমণে সর্ব্বাঙ্গীন অথবা আংশিক শোথ প্রকাশ ভিন্ন নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইয়া থাকে বলিয়া ডাক্তারেরা স্থির করিয়াছেন,—(১) শরীরের মাংসপেশের অপকর্ষ (২) কোনো কোনো স্থানে রক্তের জলীয় অংশের সঞ্চার (৩) হস্ত এবং পদ দ্বয়ের অবশ ভাব, ঐ সকল সকল স্থানে বেদনা ও পক্ষাঘাতিক অবস্থা, হৃদয়ের অস্বাচ্ছন্দ্য ও বেদনা, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, রক্তবর্ণ প্রস্রাব, নিদ্রালুতা।

এই রোগ গ্রীষ্মপ্রধান দেশজ রোগ বলিয়া পাশ্চাত্য চিকিৎসকেরা নির্ণয় করিয়াছেন। গ্রীষ্ম প্রধান দেশ হইতেই এই রোগের উৎপত্তি হইয়া নানা দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। অপরিমিত আহার অনুপযুক্ত আহার, অযথা আহার, প্রদুষ্ট জল বায়ু সেবন, শৈত্য সংস্পর্শ, প্রচণ্ড গ্রীষ্ম সেবন, রাত্রি জাগরণ, মাদক সেবন প্রভৃতি এই রোগ উৎপত্তির কারণ বলিয়া তাঁহারা

আরও নির্ণয় করিয়াছেন। বাল্যে ও বার্দ্ধক্যে এই পীড়া বড় একটা হইতে দেখা যায় না। পঞ্চদশ হইতে ত্রিংশৎ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সেই এই রোগ সর্ব্বাধিক হইয়া থাকে। বিদ্যালয়ের ছাত্র, কারাগৃহের বন্দী প্রভৃতির মধ্যে এই পীড়ার প্রাবল্য দেখা যায়। টায়ফয়েড জ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, ক্ষয় রোগ, সিফিলিস বা উপদংশ প্রভৃতি পীড়ার পরিণামে এই রোগ হইতেও দেখা যায়। গর্ভিণী, আসন্নপ্রসবা ও প্রসূতিদিগের এই পীড়ায় অধিক আক্রান্ত হইয়া সম্ভাবনা।

এই রোগ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে অল্প শিরোবেদনা, ক্রূর কোষ্ঠ, ক্ষুধামান্দ্য, হস্ত-পদাদিতে বেদনা, মাংসাশের দুর্ব্বলতা, হৃদ্-স্পন্দন, কখন বা অতিসার, কখন বা সামান্য জ্বর ভাব ও সঙ্গে সঙ্গে শোথাদির লক্ষণাদি ক্রমশঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

এই পীড়া উপস্থিত হইলে অর্দ্ধাঙ্গিক পক্ষাঘাত আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকে। ত্বক কিয়ৎপরিমাণে স্পর্শজ্ঞান বিহীন হয়। জঙ্ঘা দেশের সম্মুখ-ভাগ, চরণের উপরিভাগ ও উরুদ্বয়ের পার্শ্ব-ভাগের ত্বকের স্পর্শজ্ঞানহীনতা বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়। অঙ্গুলির অগ্রভাগ ও বাহু এবং দেহের বিশেষ বিশেষ স্থানের কিয়ৎ-পরিমাণে স্পর্শজ্ঞানহীনতাও ঘটিয়া থাকে। পাদডিম্বের কৃশতা ও উরু ডিম্বের শিথিলতা বিশেষ ভাবে হইয়া থাকে। ঐ দুই স্থানে হস্ত দ্বারা পীড়ন করিলে এরূপ বেদনা অনুমিত হয় যে, রোগী শিহরিয়া উঠে। উরু দেশের মাংসপেশী ঐরূপ বেদনা-যুক্ত হইয়া থাকে।

ডাক্তারেরা বেরিবেরিকে যে কয়ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে উপরিউক্ত লক্ষণ বিশিষ্ট বেরিবেরির নাম—পক্ষাঘাতিক বেরিবেরি। এই পক্ষাঘাতিক বেরিবেরি দুই প্রকারের আরম্ভ হয়,—১ম—আকস্মিক উৎপত্তি অর্থাৎ পূর্ব্বে কোনো চিহ্নই প্রকাশ পাইল না, রোগী রাত্রিকালে নিদ্রার পর প্রাতে পীড়াক্রান্ত হইয়া জাগরণ করিল। ২য়—চিরাগত উৎপত্তি, এইরূপ অবস্থায় লক্ষণ সমূহ প্রতিদিন অল্প অল্প করিয়া প্রকাশ পাইতে থাকে। পূর্ব্বে যে বেরিবেরির পূর্ব্বরূপের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, সেই পূর্ব্বরূপ এই চিরাগত উৎপত্তির অবস্থায় দৃষ্টিগোচর হয়।

এই পক্ষাঘাতিক বেরিবেরিতে যে সকল লক্ষণের কথা বলা হইয়াছে, তদ্ভিন্ন মূত্রাধিক্য ঘটিয়া থাকে। এই মূত্রাধিক্যের কারণ রোগীর স্নায়ুকেন্দ্র উত্তেজিত হওয়া। মস্তিষ্ক ও মেরুমজ্জা (Brain and spinal cord) শরীরস্থ সমগ্র স্নায়ু মণ্ডলীর কেন্দ্র স্থান। এই কেন্দ্র স্থান কোন প্রকারে উত্তেজিত হইলে ইন্দ্রিয়-যন্ত্রাদিতে তাহাদের অনুভূতির উদ্রেক শক্তি প্রতিফলিত হইবে। এইজন্য স্নায়ু শাখা প্রশাখা দ্বারা সেই উত্তেজনা বা অনুভূতি উদ্রেক শক্তি মূত্র যন্ত্রে (Kidney) প্রতিফলিত হয় বলিয়াই মূত্রাধিক্য ঘটিয়া থাকে। এই অনুভূতিউদ্রেকশক্তির জন্য জানুসন্ধিতে কোন প্রকার উত্তেজনার লক্ষণ অনুভব করিতে পারা যায় না অর্থাৎ জানুসন্ধিতে আদৌ বল থাকে না। এই অবস্থায়

রোগীর কোনো ইন্দ্রিয়েরই বল থাকে না। কোনো দ্রব্য হস্ত দ্বারা ধারণ পূর্ব্বক পান-আহারাদি কোনরূপ কার্য্য রোগী করিতে সমর্থ হয় না। অনেক সময়ই হস্ত কম্পনাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইন্দ্রিয় সকলের মধ্যে চক্ষু, মুখমণ্ডল, চর্ব্বণযন্ত্র, জিহ্বা প্রভৃতির মাংসাংশের পক্ষাঘাতিক অবস্থা উপলব্ধি হয় না। শরীর-দ্বার-রোধক মাংসপেশী সকলের ও মূত্রাশয়ের কার্য্যের ব্যতিক্রম ঘটে না। অন্ন-মহাস্রোতের কার্য্যকলাপও যথাবিধি সম্পাদিত হয়। কখন কখন অজীর্ণ প্রযুক্ত উদরাধ্মান ও আহারান্তে উদরের প্রপীড়ণ উপস্থিত হইয়া থাকে। গুল্ফসন্ধির বল হানি এইরূপ অবস্থায় যথেষ্ট লক্ষিত হইয়া থাকে শয্যাশায়িত রোগী শয্যা হইতে পদদ্বয় উত্তোলন করিতে পারে না এবং লম্বভাবে বা উর্দ্ধভাবে একের উপরে দ্বিতীয় পাদ স্থাপনায় সক্ষম হয় না।

পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যা বিশারদগণ পক্ষাঘাতিক বেরিবেরি ভিন্ন বেরিবেরির আর যে সকল শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন; তাহার মধ্যে ২য়টীর নাম হৃৎপিণ্ড বৈষম্য ও শোণিত সঞ্চারণ বৈষম্য বিশিষ্ট বেরিবেরি। এই পীড়ায় হৃৎপিণ্ড অধিকভাবে দূষিত হয়। বাম স্তনের নিকট এক প্রকার স্পন্দন অনুভূত হয়। শুধু বামস্তনের নিকটই নহে, এই প্রকার বেরিবেরি রোগে বক্ষঃ প্রাচীরের অনেক দূর পর্য্যন্ত হৃৎস্পন্দন উপলব্ধি হইয়া থাকে। গ্রীবা ও কণ্ঠদেশে জগুলার (Jogulars) নামক ধমনীদ্বয়েও স্পন্দন অনুভব হয়।

এইরূপ বেরিবেরি রোগে বক্ষঃ প্রাচীরে অঙ্গুলী প্রতিঘাত করিলেই স্পন্দন উপলব্ধি হইয়া থাকে। হৃদ্দেশে কর্ণ প্রয়োগ করিলে দুইটি শব্দ শ্রুত হয়। ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দের মত হৃৎপিণ্ডে দুই প্রকার শব্দ হয়। ১ম শব্দ সামান্য বিশ্রাম, তাহার পর ২য় শব্দ ও সর্ব্ব শেষে সামান্য বিশ্রাম-সময়। এইরূপ বেরিবেরি রোগে হৃৎপিণ্ড অত্যন্ত উত্তেজনা-প্রবণ হয়। সামান্য পরিশ্রমেই ইহা উত্তেজিত হইয়া পড়ে। শোণিত সঞ্চারক যন্ত্রটি বিকৃত হওয়াই ইহার কারণ। আর এক প্রকার বেরিবেরি আছে, তাহার নাম শোথ বিশিষ্ট বেরিবেরি (Dropsical Beriberi) এইরূপ বেরিবেরি রোগ স্ফীতকায় হইয়া থাকে। ইহাদের মুখ—মণ্ডল স্ফীত ও গুরুভাব ধারণ করে। ইহাদের ওষ্ঠ নীলাভ হইয়া থাকে। ইহাদের সর্ব্বস্থানে বিশেষতঃ হস্ত পদাদিতে বিশেষ ভাবে শোথ প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহারা Kidney অর্থাৎ মূত্র-পিণ্ডের তীব্র প্রদাহ ভোগ করিয়া থাকে। এই বেরিবেরি শোথের বিশেষত্ব যে, ইহাদিগের শোথ—সকল সময় সকল স্থানে থাকে না, একস্থান হইতে অপর স্থানে শোথ উপস্থিত হয়। এইরূপ পীড়ায় হৃৎপিণ্ডের বিকৃতি লক্ষণও উপস্থিত হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় রোগী গমনাগমন করিতে কষ্ট বোধ করে। শ্বাসকৃচ্ছ্রতা এইরূপ অবস্থায় অধিক লক্ষিত হয়। এইরূপ রোগীর পাদ-শোথ চলচ্ছক্তির প্রতিরোধক হয়। এইরূপ অবস্থায় গুলফ-সন্ধির পক্ষাঘাতিক অবস্থাও হইয়া থাকে এবং জানুসন্ধির স্পন্দন

(knee-gerk) লুপ্ত হইয়া থাকে। অঙ্গুলীর অগ্রভাগ ও যজ্বার সম্মুখাংশ অসার হয়। এই শোথ-বিশিষ্ট বেরিবেরি রোগীর ক্ষুধা নষ্ট হয় না, জিহ্বাও পরিষ্কার থাকে। হৃদ্-প্রদেশে বক্ষের উর্দ্ধে অস্বস্তি বোধ হয়। এই কারণেই এ শ্রেণীর রোগী ক্ষুধা সত্ত্বেও বেশী আহার করিতে পারে না। এইরূপ অবস্থায় প্রস্রাবের পরিমাণ অত্যন্ত কমিয়া যায়। বেরিবেরির শ্রেণীবিভাগে আরও দুই প্রকার বেরিবেরির পরিচয় পাওয়া যায়। একপ্রকার একত্র শোথ ও পক্ষাঘাত বিশিষ্ট বেরিবেরি (Mixed paraplegic and Dropsical cases), আর এক প্রকার গুরুত্ব ও বহু সংযোগ অনুসারে লক্ষণের সংখ্যাধিক্য (Great Variety in Degree and combination of Symptoms)। শোথ ও পক্ষাঘাত বিশিষ্ট বেরিবেরি রোগে জঙ্ঘার সম্মুখাংশ, পাদ দ্বয়, পার্শ্বদেশ, কোমর, বক্ষঃপ্রাচীরের মধ্যস্থল, গ্রীবার প্রারম্ভ স্থল প্রভৃতি স্থানে কঠিন শোথ হয়। জঙ্ঘা-প্রদেশ অসাড়ত্ব অনুভূত হয়। এই রোগে জানু-সান্ধর স্পন্দন হয় না। হৃৎ-পিণ্ডের শব্দ প্রবল ভাবে উপলব্ধি হয়। এই অবস্থায় সাধারণতঃ রোগীর স্বাস্থ্য বিশেষ বিকৃত হয় না, জিহ্বা পরিষ্কার থাকে। প্রস্রাব কম হয়।

গুরুত্ব ও বহু সংযোগ অনুসারে লক্ষণের সংখ্যাধিক্যের কথা যাহা বলিয়াছি, তাহাতে রোগী সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে পারে ও অনায়াসে সকল কার্য্য করিতে সক্ষম হয়। প্রথমতঃ রোগ অতি সামান্য বলিয়াই মনে হয়, যখন বেশী হইয়া পড়ে, তখন রোগীকে শয্যাশায়ী হইতে হয়। সেই সময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল সামর্থ্য শূন্য হইয়া পড়ে। রোগী এই সময় কঙ্কালসার হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থার রোগীকে কখন কখন শোথ-প্রযুক্ত স্ফীত হইতে দেখা যায়। স্বরভঙ্গ এরূপ রোগীর একটী বিশেষ লক্ষণ।

সকল প্রকার বেরিবেরিতেই যে মৃত্যু হইয়া থাকে—ইহা পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদেরা স্বীকার করেন না। পক্ষাঘাত সম্বন্ধীয় লক্ষণাবলী দৃষ্ট হইলে তাহাকে প্রাণ-নাশক বলিয়া বিবেচনা করিবার কোনো কারণ নাই। যদি বেরিবেরিতে শ্বাসক্রিয়া সম্পাদক মাংসপেশীসমূহ বিশেষ ভাবে জড়িত হয়, তাহা হইলে সেইরূপ বেরিবেরিতে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। হৃৎপিণ্ডের প্রসারণ—এই রোগে মৃত্যুর প্রধান কারণ। ফুসফুসে জল, হৃদয়াবরণে জল সঞ্চয়, বায়ু দ্বারা পাকাশয়ের পরিপূর্ণতা বেরিবেরি রোগে মৃত্যুকে আনয়ন করিয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদে বেরিবেরি।—আয়ুর্ব্বেদে বেরিবেরি বলিয়া স্বতন্ত্র কোনো ব্যাধি নাই। তবে নিদান-তত্ত্ব আলোচনা করিয়া আমরা শোথ রোগের সহিত ইহার সাদৃশ্য প্রমাণ করিতে পারি। আয়ুর্ব্বেদে-শোথের লক্ষণ এইরূপ,—

বহুদিন কোনো পুরাতন ব্যাধিতে ভুগিয়া শরীর দুর্ব্বল ও রক্তহীন হইলে বাতাদি দোষ কুপিত হওয়ায় ত্বক ও মাংসাশ্রিত বায়ু যখন দূষিত, রক্ত, পিত্ত, ও কফকে বাহিরের শিরা সমূহে আনয়ন করিয়া তদ্দ্বারা নিজে অবরুদ্ধ হইয়া পড়ে, তখন

হস্ত, পদ, মুখ প্রভৃতি শরীরের যে কোন স্থান ফুলিয়া পড়ে, সে ফুলার নামই শোথ। যকৃৎ দোষ, হৃদ্‌রোগ এবং বহুমূত্র বা মূত্রাল্পতা প্রভৃতি মূত্রাশয়ের পীড়া—এই ত্রিবিধ কারণেই সাধারণতঃ শোথ রোগ জন্মায়।

শোথের প্রকার ভেদ।—বাতজ, পিত্ত, কফজ, দ্বন্দ্বজ, ত্রিদোষজ, অভিঘাতজ এবং বিষজ ভেদে শোথ নয় প্রকার।

বিভিন্ন শোথের উপদ্রব ও লক্ষণ।—**বাতজ শোথ** একস্থানে ঠিক থাকে না, স্থানে স্থানে চলিয়া বেড়ায়। ঝিঁঝিঁ ধরার মত উহা ভারী হয়, টিপিলে মধ্যস্থলে বসিয়া যায় অর্থাৎ টোল খাইয়া পড়ে, কিন্তু চাপ উঠাইয়া লইলে তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ববৎ ফুলিয়া উঠে। এই প্রকার শোথ রাত্রে কমে এবং দিবসে বাড়ে। **পিত্তজ শোথ** কোমল, উহার উপর হস্ত রাখিলে উষ্ণতা অনুভূত হয় এই প্রকার শোথ রক্তবর্ণ। জ্বালা-যন্ত্রণা, জ্বর, ঘর্ম্ম, পিপাসাদি ইহার আনুষঙ্গিক উপদ্রব। **কফজ শোথ**—স্থূল, ভারী, অথচ একস্থানে স্থায়ী এবং পাণ্ডুবর্ণ। এই শোথ ধীরে ধীরে বহু বিলম্বে বর্দ্ধিত হয় এবং চিকিৎসা দ্বারা কমিবার সময় ধীরে ধীরে কমে। শোথ-স্থানে টিপিলে টোল্ খাইয়া যায়, চাপ উঠাইয়া লইলেও বহুক্ষণ পর্য্যন্ত অঙ্গুলি চাপের দাগ থাকে। কফজ শোথ রাত্রে বৃদ্ধি পায় এবং দিবসে শুকাইয়া আসে। **বাতপিত্তজ, বাতশ্লেষ্মজ ও পিত্তশ্লেষ্মজ**—এই তিন প্রকারের দ্বন্দ্বজ শোথে দুই দুইটী মিলিত লক্ষণ এবং **ত্রিদোষজ শোথে** সর্ব্ব প্রকারে মিলিত লক্ষণই প্রকাশ পায়। **অভিঘাতজ শোথ**—শীতল বায়ু লাগিলে, তুষার পাতে, সমুদ্রের জলে স্নান বা সমুদ্রের বায়ু সেবনে ও শুঁয়াপোকা, আলকুশী, ভেলা প্রভৃতির চোঁচ্ বা রস লাগিলে উৎপন্ন হয়, ইহার লক্ষণাদি পিত্তজ শোথের মত এবং ইহা সচল। **বিষজ শোথ**—বিষ ভক্ষণ, জল, সংযোগ বিরুদ্ধ আহার দ্বারা, বিষ ক্রিয়া হেতু, সবিষ সরিসৃপাদির অর্থাৎ মাকড়সা ও বৃশ্চিকাদির দংশন, সংস্পর্শ এবং তাহাদের মল মূত্রাদি গাত্রে লাগিলে অথবা বিষাক্ত বৃক্ষের বায়ু সংস্পর্শে উৎপন্ন হয়। ইহা দাহকর, বেদনা দায়ক এবং দেহের উর্দ্ধ হইতে নিম্ন দেশে সঞ্চরণশীল ও কোমল স্পর্শ।

সাধ্যাসাধ্য।—সর্ব্ব উপদ্রবযুক্ত শোথ এবং বালক, বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল রোগীর শোথ আরোগ্য হওয়া কঠিন। মধ্য দেহে ও সর্ব্বাঙ্গে শোথ হইলে তাহাও কষ্টসাধ্য। অন্য কোনো বিশেষ রোগ ব্যতীত যদি পুরুষের প্রথমে পদাদি নিম্নদেশে শোথ জন্মিয়া ক্রমশঃ উর্দ্ধদিকে মুখ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে এবং স্ত্রীলোকের যদি প্রথমে মুখাদি উর্দ্ধদেহে শোথ জন্মিয়া ক্রমশঃ নিম্নদেহে পদাদি পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে সে শোথ অসাধ্য। কিন্তু যদি উক্ত শোথ পাণ্ডু, অর্শ প্রভৃতি রোগ সাপেক্ষ্য হয়, তাহা হইলে সাধ্য। শোথের সহিত শ্বাস, অরুচি, জ্বর, পিপাসা, বমি এবং দৌর্ব্বল্য—এই সকল উপদ্রবের এক কালে উপস্থিত হইলে সে শোথ প্রাণনাশক হয়। স্ত্রী বা পুরুষের তলপেটের (মূত্রাশয়) উপরিভাগ ফুলিয়া পড়িলে এবং পুরুষের লিঙ্গ ও কোষ এবং স্ত্রীলোকের যোনি ফুলিলে, সে শোথে নিশ্চয়ই মৃত্যু ঘটে। উপরোক্ত কয় প্রকারের দুর্লক্ষণাক্রান্ত শোথ ব্যতীত অপর সকল প্রকার শোথ অত্যন্ত প্রবল ও দীর্ঘস্থায়ী হইলেও সুচিকিৎসায় নিশ্চয় আরোগ্য হয়।

পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ জনপদব্যাপী শোথ বা Epedemtc Dropsyর কথা তাঁহাদের গ্রন্থাদিতে উল্লেখ করিলেও তাঁহারা কিন্তু এই জনপদব্যাপী শোথের সহিত বেরিবেরির সাদৃশ্য ঠিক স্বীকার করেন না।

তাঁহারা বলেন,—(১) জনপদ ব্যাপী শোথ অতি দীর্ঘকাল স্থায়ী রোগ, বেরিবেরি সেরূপ দীর্ঘকাল স্থায়ী নহে। (২) শোথ রোগ সর্ব্ব প্রকার লোকের মধ্যেই উপস্থিত হইতে পারে কিন্তু বেরিবেরি রোগ যাহারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও হিতাচার সম্পন্ন, তাহাদের মধ্যে প্রায়ই হয় না। (৩) বহুজনের একত্র সমাবেশ বেরিবেরি রোগ বিস্তারের সাহায্য করে। জনপদ ব্যাপী শোথ রোগে বহু জনের সমাবেশ ক্ষতির কারণ হয় না। (৪) পাকাশয় ও অন্ত্র সংক্রান্ত রোগ বিশিষ্ট লোকদিগের মধ্যে শোথ রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে, কিন্তু বেরিবেরিতে সেরূপ হইবার কোনো কারণ নাই। (৫) শোথ রোগের প্রথম অবস্থায় গাত্রে বিস্ফোটক (Eruption) উদ্গত হয়; বেরিবেরিতে সেরূপ হয় না। (৬) শোথ রোগে কোনো না কোনো স্থানে শোথ থাকিবেই, কিন্তু বেরিবেরি পীড়ায় সকল সময় শোথ নাও থাকিতে পারে। (৭) অনেক সময় শোথ রোগের প্রথমে বা শোথের সঙ্গে জ্বর থাকে, বেরিবেরিতে জ্বর হয় না। (৮) বেরিবেরি রোগে পক্ষাঘাত একটী প্রধান লক্ষণ। শোথ রোগে কিন্তু পক্ষাঘাতিক লক্ষণ থাকে না। (৯) শোথ রোগে হৃৎপিণ্ড ও শোণিত-সঞ্চারের বিশৃঙ্খলতা ঘটিয়া থাকে। হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল ও প্রসারিত হয়, এজন্য ত্বকে দানা ও শোথ জন্মে। অঙ্গুলি পীড়ণে দানাগুলি অদৃশ্য হইয়া যায়, কিন্তু ক্রমশঃ কাল শিরার ন্যায় স্থায়ী চিহ্ন উপস্থিত হয়। বেরিবেরি রোগে হৃৎপিণ্ড ও শোণিত সঞ্চারে বিশৃঙ্খলতা ঘটে বটে, কিন্তু দানা উদ্গম বা কাল শিরা চিহ্নের আবির্ভাব ঘটে না। (১০) শোথ রোগে মূত্র কদাচিৎ অ্যালবিউমেন যুক্ত হয়। কিন্তু বেরিবেরিতে অ্যালবিউমেন থাকে না। (১১) শোথ রোগীর শোণিত-পরীক্ষায় একটি বিষ পদার্থের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। বেরিবেরি রোগে এই বিষ পদার্থ লক্ষিত হয় না। বেরিবেরির সহিত পরিপাক বিধানের কোনো সম্বন্ধ নাই।

বেরিবেরি সম্বন্ধে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য চিকিৎসার এইরূপ মতদ্বৈধ হইলেও আমরা অনেক অময় ডাক্তারেরা যাহাকে বেরিবেরি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাকে শোথ রোগের চিকিৎসা করিয়া কিন্তু সুফলই পাইয়াছি। হইতে পারে, বিসূচিকা ও কলেরার মত বেরিবেরি ও শোথ রোগে কিছু পার্থক্য থাকিতে পারে। হইতে পারে ঋষিযুগের বিসূচিকার সহিত এখনকার কলেরার যেরূপ অনেক বিষয়ে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়, ঋষিযুগের শোথ ও এখনকার বেরিবেরির মধ্যে সেইরূপ বিভিন্নতা উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু শোথ ও বেরিবেরির মূলতত্ত্ব অন্বেষণ করিলে অনেকটা একই স্বভাবের রোগ বলিয়া যদি উভয়কে ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে ঋষি উপদিষ্ট শোথ রোগের চিকিৎসার বিধি বেরিবেরিতে প্রয়োগ করিলে বিফল মনোরথ হইবার তো কোনো কারণই দেখি না। বেরিবেরি ও শোথ রোগ উভয় পীড়াতেই Heart বা হৃদয় দুর্ব্বল হইয়া থাকে, শ্বাসযন্ত্রের কষ্ট উভয় পীড়াতেই বর্ত্তমান, এ অবস্থায় বেরিবেরি ও শোথ স্বতন্ত্র রোগ বলিয়া সাব্যস্থ হইলেও উভয় রোগেই Heart যাহাতে ভাল থাকে, শ্বাস যন্ত্রের কষ্ট যাহাতে বিদূরিত হয়, তাহা তো করিতেই হইবে, সুতরাং চিকিৎসায় গোলযোগ হইবার কোনো কারণই নাই।

৮ম বর্ষের বর্ষ সূচী

(বর্ণমালানুসারে)

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
অন্ন	কবিরাজ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ বিদ্যানিধি	১৮৬
অপ্রকাশিত প্রাচীন পুঁথি	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জিনেন্দ্রনাথ সেন এম, এ,	২৬০, ২৮৩
আমরা হীনবীর্য্য কেন ?—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী		১২০
আমিষ ও নিরামিষ আহার—শ্রীমান্ ইন্দুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়		১৮৩
আয়ুর্ব্বেদ	শ্রীমান্ ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ	৪৯
আয়ুর্ব্বেদে সভ্যতা	শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র কুমার শাস্ত্রী	১৭৬
আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা	কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরত্ন	৩৩
আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা (অষ্টবিধ)	কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন	২৪৫
আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঘৃত তৈলাদির পাক-বিধি—কবিরাজ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় কবিরঞ্জন		৭৭
আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঘৃত তৈলাদির প্রকৃত পাকপ্রণালী—কবিরাজ শ্রীদ্বারকা নাথ সেনগুপ্ত কাব্য ব্যাকরণ তর্কতীর্থ		১৫৫, ২২০
আয়ুর্ব্বেদের প্রভাব	কবিরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সেনগুপ্ত কাব্যতীর্থ	২৬৫
আয়ুর্ব্বেদ শল্য চিকিৎসা—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র কুমার শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ		৪৪
আয়ুর্ব্বেদে নপংসক ছাগ—কবিরাজ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় কবিরঞ্জন		৮২
আয়ুর্ব্বেদের বনৌষধি	কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত ভিষগরত্ন এল, এম, এস	২৪৬
কফ বা শ্লেষ্মা	কবিরাজ শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সেনগুপ্ত ব্যাকরণতীর্থ	১১৩
কদলীর উপকারিতা	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়	১০০, ১৪৩, ১৭৮
কালাজ্বর	কবিরাজ শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ	২৮, ৩৯, ৬৫ ১৩৯, ২৭৮
'গুলে' গোল	শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার পাত্রী বিদ্যাভূষণ	২৫৪
চিকিৎসকের কথা	কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন	৮৯
চিকিৎসার রসৌষধ	কবিরাজ শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ	১০৯, ১৪৫
চিকিৎসা-প্রসঙ্গ	কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন	১৩৫

দ্রব্য গুণ	কবিরাজ শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর গুপ্ত কবিরঞ্জন	৪৭
দম্পতি জীবন	কবিরাজ শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ সেনগুপ্ত কাব্য-ব্যাকরণতর্কতীর্থ	৫১
দন্ত রোগের মুষ্টিযোগ	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়	৯৩
দিবোদাস	কবিরাজ শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর রায় কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ এইচ, এম, বি	৭
দুর্ব্বা	শ্রীমান্ ভোলাপদ কাব্যতীর্থ কাব্যতীর্থ	১১৯
ধর্ম্মাভাবই ধ্বংসের হেতু		১৭৩
নিদান পরিশিষ্টম্—স্বগায়	কবিরাজ হারাধন বিদ্যারত্ন	৫৪, ৭৩, ৯৬, ১২৫
পথ্যাপথ্য বিচার	ডাঃ শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র নাথ বসু কাব্যবিনোদ	১৭১, ২২১
পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ	কবিরাজ শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র সেনগুপ্ত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রী	১৩৯
পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ ও টোটকা	কবিরাজ—শ্রীযুক্ত গোষ্টবিহারী গোস্বামী বিদ্যারত্ন	১৬১
পিত্ত	কবিরাজ শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সেনগুপ্ত ব্যাকরণতীর্থ	৬৯, ১০৬
প্রকৃতি পুরুষের সংসার—কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাখাল দাস সেনগুপ্ত কাব্যতীর্থ		২২৯
প্রতিবাদ	শ্রীযুক্ত অজিতশঙ্কর দে	২৫৩
প্রাচ্য ও প্রতাচ্য	কবিরাজ শ্রীযুক্ত নীলকান্ত রায় কবিরঞ্জন	২২৬
ফাগুনে হাওয়া	শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন বি, এ	১৬৬
বর্ষ প্রশস্তিঃ	কবিরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত কবিভূষণ	১
বর্ত্তমান আয়ুর্ব্বেদ	শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র নাথ কাব্যতীর্থ	৯
বায়ু, পিত্ত, কফ	কবিরাজ শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সেনগুপ্ত ব্যাকরণতীর্থ	৩
বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যহীনতার মূল তত্ত্ব—কবিরাজ শ্রীযুক্ত নিত্যনিরঞ্জন সেনগুপ্ত বিদ্যাবিনোদ		৩৬
বিবিধ প্রসঙ্গ	সম্পাদক	৩২, ৬৩, ৮৮, ১৮৩ ২৬৩
বিসর্প	শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় চট্টোপাধ্যায় বি, এল	১৫১
বিষ বিজ্ঞান	ডাঃ শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য কাব্যবিনোদ	১৯৮
বিজ্ঞান রহস্য	শ্রীমান সরোজকুমার মহলানবিস	২৫১
বেরিবেরি	কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন	২৯৪
বৈদ্যের কথা	শ্রীমান্ ভোলাপদ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ	১৭
বুড়ী ঠান্‌দিদির উপদেশ	শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ লাল বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন বি, এ	১৯৪
মায়ের পূজা	কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন	২৮০
রস সপ্তক	শ্রীমান্ ভোলাপদ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ	২০৭
রাজবৈদ্য	"	২০৭
রোগ নির্ণয়	"	১১২
সর্প বিষের ঔষধ	... ...	১১১

সফল চিকিৎসা	কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন গুপ্ত ভিষগরত্ন এল, এ, এম, এস	২৯১
সমালোচনা	কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত ভিষগরত্ন এল, এ, এম, এস,	
সংক্ষিপ্ত সমালোচনা	সম্পাদক	২৬৩
		১৪০, ১৭০
স্বপ্ন বিবৃতি	কবিরাজ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত কাব্যতীর্থ	২২৫
স্বর্গীয় সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত ভিষগরত্ন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রী এল, এ, এম, এস,		২২৩ ২৫৭
সিদ্ধপ্রদ মুষ্টিযোগ	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়	৪০
হরীতকী	কবিরাজ শ্রীযুক্ত শীতল চন্দ্র সেনগুপ্ত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রী	১১২
হরীতকীর আত্মপ্রকাশ—শ্রীমান্ সরোজ কুমার মহলানবীশ		৬০

গ্রাহকদিগের প্রতি নিবেদন

"আয়ুর্ব্বেদে"র বর্ষারম্ভ আশ্বিনে হইয়া থাকে। কিন্তু আশ্বিন মাস—পূজার মাস বলিয়া প্রতিবৎসরই এই সময় নূতন সাজে 'কাগজ' বাহির করা বড় কষ্টকর হয়। সেই জন্য আমরা এবার ভাদ্রের সহিত আশ্বিনের সংখ্যা একত্র করিয়া ৮ম বর্ষ শেষ করিয়া দিলাম। গ্রাহকেরা এবার ১২ খানির পরিবর্ত্তে ১৩ খানি কাগজ ১২মাসে পাইবেন। অতঃপর কার্ত্তিক হইতে ইহার নবম বর্ষ আরম্ভ করা হইবে।

যতগুলি কারণে ৮ম বর্ষের পত্রিকা পরিচালনে নানারূপ বিশৃঙ্খল ঘটিয়াছে, অনেক গ্রাহকের নিকট মূল্য বাঁকী থাকাই তাহার প্রধান কারণ। বর্ত্তমান সময় প্রেসের দর, কাগজের মূল্য—সকলই অত্যধিক রূপে বাড়িয়া গিয়াছে। এ অবস্থায় গ্রাহকদিগের নিকট যদি বাঁকী রাখিয়া কার্য্য করিতে হয়, তাহা হইলে পত্রিকা পরিচালন ব্যাপার অসম্ভব হইয়া পড়ে। সেই জন্যই ৮ম বর্ষের কাগজ পূর্ব্বের মত আমরা যথাসময়ে বাহির করিতে পারি নাই, তজ্জন্য আমরা বিশেষ দুঃখিত। অতঃপর নানারূপ ক্ষতি স্বীকার করিয়াও আগামী কার্ত্তিক হইতে আমরা যাহাতে প্রতি মাসে নিয়মিত সময়ে ইহা বাহির করিতে পারি, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিব বলিয়া দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছি। কার্ত্তিক মাস হইতে নূতন আকারে—লব্ধ-প্রতিষ্ঠ কবিরাজ ও ডাক্তারগণের লেখায়—যতদূর ভাল হইতে পারে সেইভাবে প্রতিসংখ্যা বাহির হইবে। গ্রাহকেরা দয়া করিয়া আপন আপন মূল্য অবিলম্বে মণিঅর্ডারযোগে প্রেরণ করেন ইহাই বিনীত প্রার্থনা। যাঁহাদের নিকট মূল্য বাঁকী রহিয়াছে,—তাঁহারা তো মনিঅর্ডার করিবেনই, ইহা ছাড়া যে সকল সহৃদয় গ্রাহক প্রতি বৎসর বর্ষারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে ইহার মূল্য প্রদান করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করেন, তাঁহারাও অবিলম্বে ৯ম বর্ষের মূল্য মণিঅর্ডার করিবেন, ইহাও বিশেষ ভাবে প্রার্থনা। বাঙ্গালা ভাষায় আয়ুর্ব্বেদের কাগজ এইখানি মাত্রই ভরসা। সকলের সমবেত সাহায্য-প্রাপ্তি ভিন্ন আমরা এই মহান্‌কার্য্য পরিচালিত করিতে পারি না। বিশেষতঃ এই দুর্ম্মূল্যের দিনে সমস্তই অর্থ-সাপেক্ষ। আমাদের সহৃদয় পৃষ্ঠপোষক-গ্রাহক মণ্ডলী এ কথাটী বুঝিয়া কার্য্য করুন ইহাই পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা।

আশ্বিন মাসের মধ্যে যাঁহাদের মূল্য পাওয়া যাইবে না,—আগামী ৯ম বর্ষের ১ম সংখ্যা অর্থাৎ কার্ত্তিক-সংখ্যার কাগজ তাঁহাদের নামে ভিঃ পিঃতে পাঠান হইবে এবং আশাকরি, সকলে তাহা যথাসময়ে গ্রহণ করিয়া বাধিত করিবেন।